আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা

১-১৫ আগস্ট ২০২০ ১৬-৩১ শ্রাবণ ১৪২৭

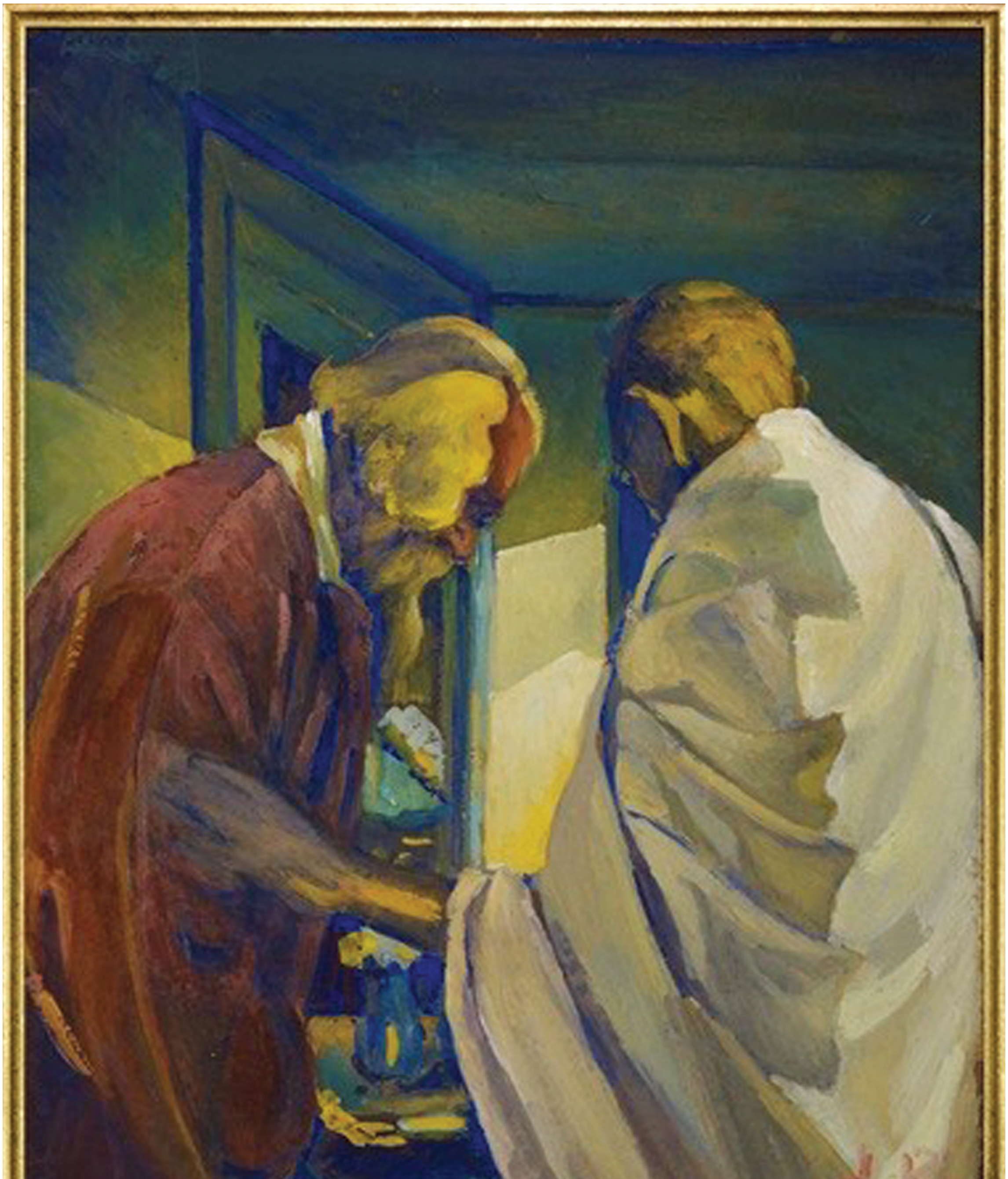

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা ১-১৫ আগস্ট ২০২০,
১৬-৩১ শ্রাবণ ১৪২৭

Vol. 8, Issue 10th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: যামিনী রায়

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টৌটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়

সংকটে ধর্মনিরপেক্ষতা ৫

কাশ্মীর: এক বছরের নিঃসঙ্গতা ৮

সমসাময়িক

স্বাস্থ্য পরিষেবার ‘আশা’ ভরসা ১০

পাঁপড় গণতন্ত্র ১২

আত্মনির্ভর অথবা আত্মবিসর্জন ১৩

অসম আরোহণ-অর্থনৈতিক চলমানতা ও সুযোগের রুদ্ধদ্বার

মৈত্রীশ ঘটক ১৫

অক্সফোর্ডের কোভিড টিকা: কিছু আশা, কিছু প্রশ্ন

স্বপন ভট্টাচার্য ১৯

দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্ব

অভিজিত গুহ ২৩

কুড়ি কুড়িতে সুবর্ণজয়ন্তী

শুভময় মৈত্র ৩০

আলুচাষি যাবেন কোথায়?

সুমন নাথ ৩৫

আত্মনির্ভর নামে ভণ্ড প্যাকেজ

সাদ্দাম হোসেন মন্ডল ৩৭

ভাষ্য, বিকল্প ভাষ্য, লিটল ম্যাগাজিন

সৌম্যজিৎ রজক ৪০

সত্যজিতে ‘মধ্যবিত্ত’-র ছবি

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট ৪৪

লেবাননের চিত্রশিল্পী ও গল্পকার খলিল জিবরান

কামরুজ্জামান ৪৮

ভাষার মৃত্যুঘণ্টার ধ্বনি

গৌতম গুহ রায় ৫২

আস্তিক-নাস্তিকের মধ্যে বার্তালাপ: একাডেমিক চর্চা

মইদুল ইসলাম ৫৫

চিঠির বাক্সো ৫৮

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা
দুই বছর : ৫০০ টাকা
তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ	উৎসা পট্টনায়ক	বি. রঘুনন্দন
সি. পি. চন্দ্রশেখর	জয়তী ঘোষ	বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট
নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

সংকটে ধর্মনিরপেক্ষতা

ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার নানা চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে। কেন্দ্রে এমন একটি সরকার ক্ষমতায় আসীন যেই সরকার ভারতের ধর্মনিরপক্ষে ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে কবরে পাঠাতে চায়। তাই অবাক হওয়ার কথা নয় যখন শ্রী লালকৃষ্ণ আডবানী, সিবিআই আদালতের সামনে সাক্ষ্য দেন যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ায় তাঁর কোনো দায় নেই। তাঁর বিরুদ্ধে মসজিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে সামিল হওয়ার যাবতীয় অভিযোগ নাকি মিথ্যা এবং তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

ফ্যাসিবাদীদের এটাই চরিত্র। তারা কখনো সত্যি কথা স্বীকার করে না। আডবানী বলছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের নেপথ্যে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। অথচ, তাঁর দল বিজেপি ১৯৮৯ সালে প্রস্তাব পাশ করে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ-স্থলকে রামজন্মভূমি বলে আখ্যায়িত করে সেখানে মন্দির বানানোর সংকল্প ঘোষণা করে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে লালকৃষ্ণ আডবানীর রথযাত্রার কথা দেশ ভোলেনি। রক্তক্ষয়ী সেই রথযাত্রা গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্রোত বইয়ে দেয়। লালকৃষ্ণ আডবানী কোনো দিন স্বীকার করেননি যে অযোধ্যার ওই স্থলে বাবরি মসজিদ রয়েছে। বরাবর তাঁরা বলেছেন ওটি মসজিদ নয়, একটি বিতর্কিত ধাঁচা, যা রাম মন্দির ধ্বংস করে তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পরে বিজেপি একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রের মুখবন্ধে বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবানী লেখেন,

> সেদিন, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২, নেতৃত্ব মানা করলেও করসেবকরা সেই ধাঁচা ভেঙে দেয়। দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্য সেদিনই রাম মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়।

প্রিয় পাঠক বাক্যটি আবার পড়ুন। একদিকে বলা হল করসেবকরা নাকি নেতৃত্বের কথা না শুনে মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। আবার একই সঙ্গে বলা হল যে রাম মন্দিরের নির্মাণও সেই মসজিদ ভেঙেই শুরু হয়েছে, যেই মন্দির নির্মাণের সংকল্প বিজেপি-র রাজনৈতিক এজেন্ডাতেই ছিল। আডবানীরা জানেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সেই সময়

মসজিদ ভেঙে ফেলেছি বললে তাঁদের জেল হত। তাই বকধার্মিকের মতন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস আন্দোলনের নেতা আডবানী। করসেবকদের কাজকে কখনো নিন্দা করেননি তিনি, বরং প্রশংসাই করেছেন। আবার একইসঙ্গে রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ যে মসজিদ ভেঙেই শুরু হয়েছে, তাও বলেছেন। এই দ্বিচারিতা, এই ভণ্ডামি একজন খাঁটি ফ্যাসিস্তের থেকেই আশা করা যায়। যাঁরা মাঝে মাঝে আডবানীকে মোদীর তুলনায় বেশি উদার মনে করেন, তাঁরা ইতিহাস ভুলে গেছেন, তাঁরা মিডিয়ার সস্তা কথায় সহজে প্রভাবিত হন। সত্য এটাই সংঘ পরিবারে বেড়ে ওঠা আডবানী ও মোদীর মধ্যে কোনো ফারাক নেই। দুজনেই সমান সাম্প্রদায়িক, সমান বিভেদকামী এবং দুজনেই হিংসার রাজনীতিকে পাথেয় করে ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন।

সরযূ নদী দিয়ে অবশ্য অনেক জল বয়ে গেছে। লালকৃষ্ণ আডবানী উক্ত শ্বেতপত্রে বলেছেন, ভারতের কোর্ট তাঁদের কথা শুনছে না, বলেছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হলেও করসেবকেরা যেমন একদিকে ভারতের পরাধীনতার প্রতীককে মুছে দিয়েছেন, অন্যদিকে ভারতের প্রেস, পার্লামেন্ট, সবাই বিজেপি-র বিরুদ্ধে চলে গেছে। এখানে পরাধীনতা কথাটি প্রণিধানযোগ্য। স্বাভাবিকভাবেই যেই সংগঠন কখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, তাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক সৌধই পরাধীনতার প্রতীক। আজ ২৭ বছর পরে, লালকৃষ্ণ আডবানীর আর কোনো খেদ থাকার কথা নয়। পার্লামেন্টে বিজেপি-র প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রেস বা মিডিয়া তাদের পকেটে এবং সর্বপরি দেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদের জমি হিন্দুদের দিয়ে দিয়েছেন, যেখানে রাম মন্দির স্থাপিত হবে।

সেই রাম মন্দিরের শিলান্যাসের দিন ধার্য করা হয়েছে ৫ আগস্ট। করোনাকালে জনসমাবেশ বন্ধ। কিন্তু রাম মন্দিরে শিলান্যাস হবে। ইতিমধ্যেই এক পুরোহিত এবং অকুস্থলে কর্মরত ১৬ জন পুলিশ করোনা আক্রান্ত। তবু, সেইদিন, প্রধানমন্ত্রী মোদী রাম মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। একই সঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ উদারবাদী ইতিহাসের উপরে আরো একবার কুঠারাঘাত হবে। যেই দেশ, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ফলে বিভাজিত হয়েও, ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিল, সেই দেশে একটি মসজিদ ভেঙে মন্দির স্থাপিত হওয়ার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী।

বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দিরের শিলান্যাসের যাত্রা আমাদের কতটা পিছিয়ে দিল, তা একটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের পরে তার উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। নেহরু এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির বিরোধীতা করেন। সংঘ পরিবারের লোকেরা প্রচার করে নেহরু সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের বিরোধীতা করেছিলেন। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তিনি শুধু বলেছিলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান, রাষ্ট্রপতি, কেন একটি ধর্মের প্রার্থনাস্থল উদ্‌বোধন করতে যাবেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা কখনোই এমন কিছু করতে পারি না, যেখানে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে। আজ এই কথাগুলি পড়লে মনে হয় কথাগুলি বাসি হয়ে গেছে। আর কোনো মানে নেই। সত্যিই তাই, আজ ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত নড়ে গেছে, আজ মিডিয়া রাম মন্দিরের জয়গান গায়, পার্লামেন্টে জয় শ্রীরাম শ্লোগান ওঠে, আজ গোরুর নামে মানুষ বধ হয় দেশে, আজ মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ে ওঠে দেশে। আজ নেহরু যুগ সমাপ্ত।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতির সমস্যা অবশ্য গোটা পৃথিবীতেই বাড়ছে। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার সেই দেশে নাকি রাম জন্মভূমির খোঁজ পেয়েছে। আবার তুরস্কে হায়া সোফিয়াকে রাতারাতি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। হায়া সোফিয়া ১৫০০ বছর আগে গির্জা ছিল, যা অটোমান সম্রাট মসজিদে রূপান্তরিত করে। তুরস্কে আতাতুর্ক ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে হায়া সোফিয়াকে সংগ্রহশালা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এর্দোগান সরকার এই প্রাচীন স্থাপত্যকে মসজিদে রূপান্তরিত করে কামাল আতাতুর্ক প্রণিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে। যেমন আমাদের দেশে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে নির্মিত হচ্ছে রাম মন্দির, হায়া সোফিয়ার মসজিদে রূপান্তর একই ধর্মের রাজনীতির অপর দিক।

এই কঠিন সময়েও ভারতের সুমহান ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতেই হবে। যেই সুপ্রিম কোর্টের রায় বাবরি মসজিদের জমি হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই রায়ের পাতাতেই কিছু কথা লেখা

আছে যা বিজেপি-র আখ্যানের বিরোধী। সুপ্রিম কোর্টে হিন্দু পক্ষের তরফে দাবি করা হয় যে বাবরি মসজিদ বলে আদৌ কিছু ছিল না। ওই সৌধটি রামের জন্মস্থান যেখানে হিন্দুরা বহু বছর ধরে পুজো করে আসছে। অতএব, মুসলমান সমাজের ওই সৌধের প্রতি কোনো দাবি থাকারই কথা নয় কারণ কোনো প্রকৃত মুসলমান তাকে মসজিদ বলে মানবে না। এই যুক্তির রাজনৈতিক বয়ান আমরা লালকৃষ্ণ আডবানী-সহ সংঘের বহু নেতাকে বলতে শুনেছি যখন তাঁরা বাবরি মসজিদকে বিতর্কিত ধাঁচা বলে অভিহিত করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট হিন্দু পক্ষের এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মাননীয় বিচারপতিরা বলেছেন যে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালের আগে ওই স্থানে একটি মসজিদ ছিল এবং মুসলমানরা কখনোই এই মসজিদের দাবি ছাড়েননি। বরং ১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর রাত্রে মসজিদের ভিতরে রামের মূর্তি বসানো বেআইনি ছিল এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস আইনের শাসনের বিরুদ্ধে করা একটি বেআইনি কাজ। অর্থাৎ, আডবানী ও সংঘের নেতারা মিথ্যা বলেছিলেন। অযোধ্যার ওই স্থলে একটি মসজিদ ছিল, যা ধ্বংস করেই সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ হচ্ছে। যেই নির্মাণের প্রথম আলো বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার দিনই দেখতে পেয়েছিলেন আডবানী।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত দলিল দস্তাবেজের বিচার করে সুপ্রিম কোর্ট জানান যে বাবরি মসজিদের নীচে অ-ইসমালীয় কাঠামোর অস্তিত্ব থাকলেও তা ভেঙে যে এই মসজিদ গড়া হয়েছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। এবং এই অ-ইসমালীয় কাঠামো যে রাম মন্দির তারও কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ, প্রমাণিত হল যে সংঘ পরিবার লাগাতার দেশের মানুষকে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত করেছে যে রাম মন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদের গঠন হয়। এরকম কোনো ঘটনা ইতিহাসে ঘটার প্রমাণ নেই। একটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য এই দুটি পর্যবেক্ষণের পরেও দেশের মহামান্য আদালত অযোধ্যার সেই জমি হিন্দুদের হাতে তুলে দেন। (*আরেক রকম*, ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০১৯ সম্পাদকীয়তে বিশদে এই রায় আলোচিত হয়েছে)

তবু, যাঁরা হিন্দু, যাঁরা রামকে ঈশ্বর বলে মানেন, তাঁরা একবার ভাববেন, কোন মূল্যের বিনিময়ে রামের মন্দির গড়া হচ্ছে। একটি ধর্মের উপাসনা স্থলকে ভেঙে সেখানে কখনো ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হতে পারেন? হাজার হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে যেই বিবাদ তা কখনো আধ্যাত্মিকতার উৎস হতে পারে? ধর্ম এবং রাজনীতির মিশেলে তৈরি যে গরল সংঘ পরিবার গোটা দেশে ছড়িয়ে চলেছে, তার সঙ্গে কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণার কোনো সম্পর্ক রয়েছে? রাম মন্দির তৈরি করতে কোনোদিন কেউ আপত্তি জানাননি। কিন্তু মসজিদ ভেঙেই রাম মন্দির তৈরি করার সংকল্পে ধর্ম ছিল না, বিভেদের রাজনীতি ছিল। সেই রাজনীতির আপাতত জয় হয়েছে। আডবানীদের সংকল্প সত্যি হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি থেমে থাকতে পারে না। আর কোনো মসজিদ বা গির্জা ভেঙে যেন মন্দির তৈরি না হয়, ধর্মের নামে মানুষ খুন করার রাজনীতিকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প আমাদের নিতে হবে। গণশত্রু ছবিতে চরণামৃতে জীবাণু আছে প্রমাণ করেছিলেন যেই ডাক্তার, তাঁর যখন সবকিছু ধ্বংসের মুখে তখনও তিনি আশার আলো দেখেছিলেন নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে। আশা কখনো ফুরিয়ে যায় না। এনআরসি-সিএএ আন্দোলনে যেই অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তরুণ-তরুণী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অংশগ্রহণ করেছিলেন যেই শ্রমিকরা ভারতের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ধর্মঘট করেছেন, যেই চাষিরা মাইলের পর মাইল লংমার্চে সামিল হয়েছেন, যারা এখনও ধর্মনির্বিশেষে মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাঁরাই নতুন ভারত গড়বেন, যেখানে মন্দির-মসজিদ নয়, রাজনীতি হবে মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে, মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। এই সংকল্পে আমরা যেন অবিচল থাকি।

কাশ্মীর: এক বছরের নিঃসঙ্গতা

জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা লোপের এক বছর সম্পূর্ণ হবে ৫ আগস্ট। এই এক বছরে কতটা কী পেয়েছে কাশ্মীর, দেশের তথাকথিত মূলস্রোতের অংশীদার হয়ে এই অঞ্চলের কতটা লাভ হয়েছে, সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি বোঝার আগে একটা কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্যের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পরে। কয়েকদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর জিসি মুর্মু জানিয়েছেন যে এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন, কিন্তু ভয়ে সে কথা বলতে পারেন না। কার ভয়, সেটা মুর্মু খোলসা করেননি। যদি জঙ্গীদের ভয়েই মানুষ চুপ করে থাকে, তাহলে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা লোপ এবং জঙ্গী-সমস্যা দমনে বিজেপি সরকারের এত বড়ো বড়ো ঢক্কা নিনাদের এত করুণ পরিণতি কেন হল যে এখনও জঙ্গীদের এত প্রতাপ? আর যদি সরকারের বা ভারত রাষ্ট্রের ভয়ে মানুষ চুপ থাকেন, তাহলে তো ৩৭০ ধারা লোপ করা আরোই বেশি করে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে সেখানে স্বৈরাচারের আমদানি হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তে আসতে হয়। মুর্মু খুলে না বললেও এই মন্তব্য অতীব কৌতুহলোদ্দীপক, কারণ এটা আদতে বিজেপি সরকারের ব্যর্থতারই পরিচায়ক।

তবে ব্যর্থতা শুধুমাত্র গণতন্ত্র ফেরানো বা হিংসা দমনে নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বড়োসড়ো অশ্বডিম্ব ছাড়া আর বেশি কিছু প্রসব হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন জুলাই মাসের একটি সমীক্ষায় দেখেছে যে ২০১৫ সালে ঘোষণা হওয়া প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের মাত্র ৪৯ শতাংশ এই পাঁচ বছরে খরচ হয়েছে। ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদী যখন এই প্যাকেজ ঘোষণা করেন, কাশ্মীরে তখন ক্ষমতায় মেহবুবা মুফতি আর বিজেপি-র জোট সরকার। ৫৪টি প্রজেক্টের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় সাড়ে আটান্ন হাজার কোটি টাকা। পাঁচ বছরে উনত্রিশ হাজার কোটি টাকার কম খরচ হয়েছে। আর এই চুয়ান্নটির মধ্যে শেষ হয়েছে মাত্র আটটি প্রজেক্ট। জম্মু থেকে পুঁছ পর্যন্ত রাস্তা বানাবার বড়ো প্রজেক্ট অথবা শ্রীনগরকে ঘিরে রিং রোড বানাবার প্রকল্প, সবই আটকে আছে সরকারি দীর্ঘসূত্রিতায়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে স্থানীয় কাগজগুলিতে বড়ো সরকারি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, ৩৭০ ধারা বিলোপের সুবিধেগুলি কী হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান সুবিধে যেটার উল্লেখ হয়েছিল, তা ছিল অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও উন্নয়ন। বছর ঘোরার পর সেই প্রতিশ্রুতি যে কতটা ফাঁপা, আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু কাজ হয়েছে, যেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে কাজে দেয়। যেমন রাজ্যের বাইরের মানুষকে বিয়ে করা জম্মু কাশ্মীরের মহিলাদের সম্পত্তির উপর অধিকার আইন বলবৎ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা কুড়ি হাজারেরও বেশি উদ্‌বাস্তুর নাগরিকত্ব মিলেছে। কিন্তু এই সমস্তটাই বিজেপি-র রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ ছিল। তার বাইরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুই হয়নি, আর তাই জিসি মুর্মুকেও স্বীকার করতে হয় যে মানুষ উন্নয়ন চান। মানুষ না হয় জঙ্গীদের ভয়ে মুখ খোলেন না। কিন্তু প্রশাসনও কি জঙ্গীদের ভয়ে উন্নয়ন করছে না। তাহলে এমন অপদার্থ প্রশাসন রেখে লাভ কী!

আর গণতন্ত্র ফেরানোর তথাকথিত প্রয়াস? এখনও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সমতা রেখে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম করা যায়নি। বিধানসভা নির্বাচন কবে হবে সেখানে কেউ জানে না। করোনার জন্য সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত হয়ে আদতে বিজেপি-র লাভই হয়েছে কারণ তা না হলে এই সীমাহীন ব্যর্থতার জন্য তাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। বহু রাজনৈতিক নেতা এখনও গৃহবন্দি আছেন দীর্ঘদিন ধরে। করোনা আসার বহু আগে লকডাউন চলেছে কাশ্মীরে। মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, গোটা একটা রাজ্যকে রাষ্ট্র গায়ের জোরেড় ঘরবন্দি করে রাখে। ন্যূনতম প্রতিবাদের জবাবেও মিলছে গুলি। আরো অনেকেই জেলের ভেতর। মেহবুবা মুফতি এখনও আটক হয়ে আছেন। ৪-জি ইন্টারনেট পরিষেবা এখনও শুরু হয়নি। এদিকে ২০২০ সালের ২৭ জুলাই অবধি কাশ্মীরে বিভিন্ন আতঙ্কবাদী ঘটনায় মৃত হয়েছেন, ১৭ জন নাগরিক, ৩৮ জন সামরিক ব্যক্তি এবং ১৫৪ জন উগ্রপন্থী। প্রমাণ হয়, ৩৭০ লোপ হলে উগ্রপন্থা কমবে কথাটি মিথ্যে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী খবর করার অভিযোগে সাংবাদিকদের আটক করা এবং আইনি ব্যবস্থা নেবার মতো ঘটনা ঘটছে ভুরিভুরি। এরকম অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কীভাবে গণতন্ত্র ফেরাতে পারে?

এক বছর আগে বিজেপি যেটা করেছে তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না কারণ এটা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যেই ছিল। কিন্তু যেটা অবাক হবার বিষয়, তা ছিল অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে মমতা বা কংগ্রেস নেতারা, কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি, আর আজ তার মাশুল দিয়ে যেতে হচ্ছে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে। একটা রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে দুটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেওয়া হল, অতীতে এমন ঘটনা দেখা গেছে কি? বরং সাধারণত যা হয়েছে বরাবর, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। কাশ্মীরের এই অবনমন তার অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিনিয়োগের অপ্রতুলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। ৩৭০ ধারা বিলোপের কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল তা বিচ্ছিন্নতাবাদ কমাতে সাহায্য করবে। এক বছর পেরিয়ে এসে কেন্দ্র নিজে সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং জঙ্গী সমস্যা একটা বড়ো মাথাব্যথার কারণ। জিসি মুর্মুর কথাতেও সেটা স্পষ্ট, শুরুতেই যার উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিনিয়োগ বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে তো আগেই বলা হয়েছে। বিজেপি এটাও জানিয়েছিল যে ৩৭০ ধারা বিলোপে কাশ্মীরে দারিদ্র কমবে। বাস্তব এটাই যে কাশ্মীরে দারিদ্রের মাত্রা বেশিরভাগ রাজ্যের থেকে কম ছিল। গুজরাটে যত সংখ্যক দরিদ্র মানুষ, কাশ্মীরে তার শতাংশের হিসেবেও আসে না। বিজেপি নিজের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়িত করেছে সত্যি, তার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা বাদে অন্যান্য দলগুলি নীরব থেকেছে, আর এর বিনিময়ে একটা অঞ্চল ধ্বংসের মুখে যাত্রা শুরু করেছে।

এই এক বছরে যেটা বিজেপি বারবার দেখাতে চেয়েছে যে ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের প্রতি ছিল একটা অনুগ্রহ বিশেষ। যে সত্যিটা তারা ভুলিয়ে দিতে চায় তা হল যে কাশ্মীরের ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার প্রক্রিয়াটির অঙ্গই ছিল ৩৭০ ধারা, যা কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং শর্ত। একটি মুসলিমপ্রধান অঞ্চল ভারতবর্ষের অঙ্গ হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সার্বভৌমত্বের দাবিতে, ইতিহাসে এরকম উজ্জ্বল উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। এই ঘটনা ভারতবর্ষের সেকুলার তকমাটিকেই বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছিল। বিজেপি নিজের নোংরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের সেই উজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে ধুলোয় মিশিয়ে ছেড়েছে। তার থেকেও বড়ো কথা, এই পুরো ব্যাপারটাই তারা ঘটিয়েছে কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যেখানে এতটাই নিষ্কর্মা, সেখানে বিজেপি-র মতো মধ্যযুগীয় শক্তিই যে কায়েম থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কী!

কাশ্মীরি সাংবাদিক সুজাত বুখারি যখন অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, উমর আবদুল্লা বলেছিলেন সুজাতের রক্ত আমাদের সবার হাতে লেগে রয়েছে। কাশ্মীরের রক্ত আপাতত লেগে আছে একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সেই প্রত্যেকের হাতে, যারা প্রতিবাদ করেননি। এই রক্তের দায় আগামী বহুদিন চুকিয়ে যেতে হবে। সাউথ ব্লক শুধু নয়। গোটা দেশকেই।

সমসাময়িক

স্বাস্থ্য পরিষেবার 'আশা' ভরসা

তালি থালি দিয়ালি। অতঃপর পুষ্পবৃষ্টি। কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আহমেদাবাদ থেকে আইজল-ইমফল বিমান উড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হল ফুলের পাপড়ি। সংক্রমণ প্রতিহত করতে দিন-রাত এক করে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের শুভেচ্ছা-উৎসাহ দেওয়ার জন্য নাকি এইসব চোখ ধাঁধানো চমকপ্রদ উদ্যোগ। অন্তত প্রচারে সেই কথা বলা হল। বিভিন্ন মাধ্যমে ডাক্তার-নার্স থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনিক কর্মী-আধিকারিক সাফাইকর্মী সকলের জন্য শুভকামনার বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু তাঁদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা, বিশ্রামের যথাযথ বন্দোবস্ত করার বিষয়ে কোনো নজরই দেওয়া হল না। আর আশাকর্মীরা থেকে গেলেন পুরোপুরি উপেক্ষিত। তাঁদের জন্য একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

উত্তর ভারতে আশাদিদি। আর দক্ষিণে আশাআম্মা। দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামের অতি পরিচিত নাম। গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের শরীর-স্বাস্থ্যের খবর তাঁর নখদর্পণে। আবার গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দা জানেন কবে কখন কোথায় আশাদিদিকে পাওয়া যাবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ২০০৫-এ গড়ে তোলা শুরু হয় দেশের গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাথমিক পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ।

ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন বা এনএইচআরএম প্রকল্প প্রণয়নের সময় খেয়াল হয় যে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক (পি এইচ সি) বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র (এস এইচ সি) গড়লেই হবে না, গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রচার চালাতে হবে। গ্রামের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি খবর রাখা সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তথ্য ভাণ্ডার বা ডেটাবেস ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী। তখনই স্থির হয় যে এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা প্রয়োজন। সরকারি পরিভাষায় নাম হল, 'অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট' সংক্ষেপে আশা। ২০১৩ পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৭০ হাজার আশাকর্মী দেশের গ্রামে গ্রামে নিযুক্ত হয়েছেন। তারপরের হিসেব সরকারি নথিতে সুস্পষ্ট নয়।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই একেবারে নিচুতলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অন্তত একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকার কথা। দুজন অক্সিলিয়ারী নার্স মিডওয়াইফ সংক্ষেপে এএনএম (প্রথম ও দ্বিতীয়) পদমর্যাদার কর্মীদের এক একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সামলানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতিদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও শিশুদের বিভিন্ন টিকাকরণের কাজ দেখভাল করেন তাঁরা। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ফাইলেরিয়া আক্রান্তদের খুঁজে বের করা, তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ও এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপরেই বর্তায়। ফলে আশাকর্মীরাই গত বারো-চোদ্দো বছর ধরে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল চালিকাশক্তি।

এক একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে বেশ কয়েকজন করে আশাকর্মী থাকেন। কম-বেশি তেরোশো-চোদ্দোশো জনসংখ্যার গ্রামীণ এলাকা ধরে চলে তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম। এলাকার বিভিন্ন পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া, আসন্ন প্রসবার প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের, প্রয়োজনে পিএইচসি-র চিকিৎসক (যদি থাকেন) ও এএনএম-এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে প্রসবকালে গর্ভবতীদের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোতে সহায়তা করা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোতে প্রয়োজনে গাড়ির ব্যবস্থা করা, প্রসবকালে সঙ্গ দেওয়া থেকে নবজাতকের টিকাকরণের কর্মসূচি অবগত করার মতো কাজগুলি আশাকর্মীদের দায়িত্ব।

আশাকর্মীদের নিয়োগ করে স্থানীয় পঞ্চায়েত। কাজেই প্রতিটি আশাকর্মী সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কাছে কাজের হিসেব দিতে দায়বদ্ধ। সাধারণত গ্রামের বিবাহিতা অথবা বিধবা মহিলাদের নিয়োগ করা হয়। বিয়ের পর অন্যত্র চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণভাবে অবিবাহিতাদের আশাকর্মী হওয়ার সুযোগ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা ন্যূনতম যোগ্যতা বলা হলেও প্রয়োজনে নিয়োগকর্তা অর্থাৎ পঞ্চায়েত শিথিল করতে পারে। তবে বয়স কিন্তু পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক। কারণ সারাদিন প্রচুর হাঁটাহাঁটি, কথা বলা, তথ্য সাজানো এককথায় হাজারো কাজ একজন অথবা দুজন মিলে সামলাতে হয়। এত কিছুর পর মাসের শেষে পারিশ্রমিক কত? বেতন বলা যাবে না। কারণ আশা নামের মধ্যেই স্বেচ্ছা শ্রমের বিষয়টি জড়িয়ে আছে। পারিশ্রমিক হিসেবে জোটে মাসে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। তফসিলি জাতি, জনজাতি ও দুর্গম এলাকা অনুসারে সর্বাধিক ছয় থেকে সাড়ে আট হাজার টাকা, যা একজন দিনমজুরের জন্য সরকার নির্ধারিত দৈনন্দিন মজুরির থেকে অনেক কম।

করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করতে দেশব্যাপী যে যুদ্ধ চলছে তার একেবারে অগ্রণী বাহিনীর প্রকৃত অর্থে পদাতিক সৈন্য

কিন্তু এই আশাকর্মী। নিত্যকার দায়িত্ব পালনের সঙ্গে এখন জুড়েছে করোনা সংক্রান্ত তথ্য আহরণের কাজ।

পথঘাট সুনসান। মাথার উপরে গনগনে রোদ। অথবা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। করোনা আতঙ্কে সকলেই ঘরবন্দি। আর ফাঁকা রাস্তায় ছাতা মাথায় হেঁটে যাচ্ছেন এক স্বাস্থ্যকর্মী। গ্রামের মানুষের আশাদিদি। কখনো সঙ্গী হন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোনো এক এএনএম দিদিমণি। করোনা-ভীতি উপেক্ষা করেই গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন আশাকর্মীরা। সাতসকালেই বেরিয়ে পড়ছেন তাঁরা। আশাদিদি বা এএনএম দিদিমণিদের যাতায়াত যেহেতু বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে, তাই করোনা মোকাবিলায় বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চেপেছে তাঁদের উপরেই। গ্রামের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া, এক মহল্লা থেকে আর এক মহল্লা চষে তুলে আনছেন নানা তথ্য। নতুন কে ঘরে ফিরল, ফিরলে কোথা থেকে ফিরেছে, কবে ফিরেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিল কি না, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু কোনো কাগজ দিয়েছেন কি না, এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব চাই। প্রয়োজনে হোম কোয়ারিন্টিন কাকে বলে, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তা-ও বোঝাতে হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। যাঁরা ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছেন তাঁদের কারো জ্বর এসেছে কি না, অথবা বাড়ির কেউ জ্বরে ভুগছেন কি না, জ্বর না থাকলে অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা বা উপসর্গ রয়েছে কি না, খুঁটিনাটি জানতে হচ্ছে সবই। দেশের বেশিরভাগ গ্রামেই সাধারণ মানুষের বসবাসের ঘরের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় একটি বা দুটি ঘরেই কার্যত গাদাগাদি করে পরিবারের সকলকে থাকতে হয়। এই পরিস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে কীভাবে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তার পরামর্শও দিচ্ছেন আশাকর্মীরা। এ তো গেল যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে অন্য রাজ্য থেকে ঘরে ফিরেছেন সেইসব শ্রমিকদের কথা। এছাড়া, অনেকেই আছেন, যাঁরা নিজস্ব উদ্যোগে বাড়ি ফিরেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি হয়তো এমন কোনো রাজ্যে কর্মরত ছিলেন, যে রাজ্যে সংক্রমণের সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ বাড়ি ফেরার পর তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে কোনোরকম শারীরিক পরীক্ষাই করাননি। অনেকে ফিরছেন চুপিসারে। স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে এইসব ব্যক্তিদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো, পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করার মতো ঝামেলার কাজও জুড়েছে এই পরিস্থিতিতে। এখানেই শেষ নয়। কোয়ারান্টিনে থাকা লোকজন নিভৃতবাসের পরামর্শ মানতে না চাইলে বা ১৪ দিনের কোয়ারিন্টিন চলাকালীন পাড়ার চায়ের দোকান বা পুকুর পাড়ে আড্ডার খবর পেলে এএনএম দিদিমণিদের মাধ্যমে এলাকার সিভিক ভলান্টিয়ার বা পুলিশের কাছে খবর পাঠানোর কাজও করতে হচ্ছে আশাদিদিদেরই। পরে তাঁদের সংগৃহিত করোনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম দিদিমণিদের কাছে। প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তা পৌঁছোচ্ছে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আর সেখান থেকে জেলায় এইভাবে করোনা মোকাবিলায় একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে লড়াই করছেন অশাকর্মীরাই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জরুরি পরিস্থিতিতে অনেক বাড়তি কাজ ঢুকে পড়ছে আশাকর্মীদের বাড়ির অন্দরেও। তাই প্রতিদিনের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সংসার, সন্তানকে সামলানোর ফাঁকেও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিদিমণিদের কাছে ফোনের মাধ্যমে এলাকার খুঁটিনাটি পৌঁছে দিতে সদাব্যস্ত আশাদিদিরা। দিনে ৮-১২ ঘন্টা রোগীদের পরিচর্যা করার পর কোনো কোনো আশাকর্মীকে আবার পরিস্থিতি অনুসারে প্রসূতি এবং গর্ভবতী মা ও সদ্যোজাত শিশুদের সেবা এবং দেখভাল করার জন্য সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে হয়। এছাড়া বাচ্চাদের টিকাকরণ ও পাল্‌স পোলিয়ো থেকে শুরু করে রাত-বিরেতে দুর্যোগে যেকোনো সময় আসন্নপ্রসবাদের নিয়ে গাড়িতে করে ব্লক হাসপাতালে যাওয়ার মতো প্রায় প্রতিদিনের কাজ তো রয়েইছে।

অথচ করোনা মোকাবিলায় আশাকর্মীরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখার কোনোরকম সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। রাষ্ট্র আশাকর্মীদের ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই যুদ্ধে সামিল করে দিয়েছে। সংক্রমণ যেভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে যদি আশাকর্মীরা আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে নড়বড়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার যেটুকু কোনোরকমে এখনও টিকে আছে তা কিন্তু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। আশাকর্মীদের সেই অর্থে কোনো বেতন নেই। শারীরিক সুরক্ষার সামান্যতম সুযোগ নেই। এমনকী সরকারি স্বীকৃতিও নেই। কাজেই রাষ্ট্রের মৌখিক প্রশংসায় আশাকর্মীদের নাম উচ্চারণ করা হয় না। কারো খেয়াল থাকে না যে প্রদীপের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পিলসুজেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পিলসুজ অকেজো হয়ে পড়লে ঘটা করে দিয়া জ্বালিয়ে হাততালি দেওয়ার সুযোগ হারিয়ে যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৯ লক্ষের মতো আশাকর্মীকে নিয়ে না ভাবলেও চলবে। সংকটের দিনে তাঁরা যেভাবে মুখ বুজে দেশের প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাঁচিয়ে রাখছেন তার কোনো স্বীকৃতি নেই। কিন্তু খেয়াল থাকে না যে করোনাভাইরাসও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব। তার দাপটে সমাজসভ্যতার নাজেহাল অবস্থা। মুখ বুজে কাজ করে যাওয়া মাত্র ৯ লক্ষের মতো আশাকর্মী সংক্রমণ প্রতিহত করার সময় কোনোভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়লে স্বাস্থ্য পরিষেবা টিকে থাকবে তো? অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আশাকর্মীদের আর্থিক ও শারীরিক সুরক্ষায় রাষ্ট্র এগিয়ে আসুক।

পাঁপড় গণতন্ত্র

মুখে মুখোশ না পরায় উত্তরপ্রদেশে ছাগলকে গ্রেপ্তার করল কানপুর পুলিশ। একটি সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০২০।

আপনি লকডাউন মেনেছেন, আত্মীয়স্বজন রোগগ্রস্ত হলে দেখতে যাননি, শ্মশানে পা মাড়াননি, ছেলেমেয়েকে প্রাণে ধরে পড়তে পাঠাননি, হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় যাননি, রোগ সহ্য করেছেন, লাখ লাখ মানুষ আধ-পেটা খেয়ে থেকেছেন, লাখ লাখ মানুষ ভিখারি হয়ে গেছেন, ১৪ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, কোনো প্রতিবাদ না করে, বেতনহীন কোটি কোটি মানুষ, আধা সিকি বেতনে কাজ করছেন, কতজন— প্রতিবাদ করেননি— কেননা এখন অফিসিয়ালি লকডাউন ও আনলক ১, ২ চলছে।

আপনি থেমে ওঁরা কিন্তু থেমে নেই। ২৩টা সরকারি সংস্থা বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেলের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত পাকা করেছে, ১৫ লাখ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারির পেনশন বন্ধ করেছে, ১১ লাখ কর্মীর বেতন। জম্মু-কাশ্মীরে অরণ্য-দপ্তর পর্যন্ত তুলে দিয়েছে বেসরকারি হাতে, জম্মুতে সরকারি রাস্তাতেও চালু হয়েছে, টোল ট্যাক্স, তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন না। কেননা জানতে দেয়নি, পোষা মিডিয়া। আপনি লাইন দিয়েই যাচ্ছেন, নোটবন্দির লাইন, আধার কার্ডের লাইন, ব্যাঙ্ক, গ্যাসে আধার কার্ড সংযুক্তির লাইন, জিএসটি অন্তর্ভুক্তির লাইন, খাবারের জন্য লাইন এবং ভোটের জন্য লাইন। আপনি লাইন দিচ্ছেন ওদিকে বেলাইনে দেশ বিক্রি সারা। সব বেচে দিচ্ছে। কিনছে এমএলএ, এমপি, বিচারশালা এবং সংবাদমাধ্যম।

রাজ্যভবনগুলো এখন বিজেপি-র দলীয় অফিসকেও লজ্জা দেবে। সংবিধান শিকেয়। সারা দেশে বিধায়ক ৪,১২৩। এর মধ্যে বিজেপি-র ১,৩০৬ জন। তাঁর মধ্যে ১৪৫ জন কেনা। ১০ শতাংশের বেশি বিধায়ক কেনা। উত্তরাখণ্ডে কিনেছে ৯ জন, অরুণাচল প্রদেশ ৪৩ জন, মণিপুরে ৪ জন, কর্ণাটকে ১৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৯ জন, গোয়ার ১০ জন, সিকিমে ৩২ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১২ জন। পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৩ এখন ১২।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাকি সব জায়গায় বিধায়ক কিনে সরকার গড়েছে। কোথাও কোথাও সরকার ভেঙে সরকার গঠন করেছে। কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ তার সাম্প্রতিক আগ্রাসী নিদর্শন। মেঘালয়ে ২ জন বিধায়ক নিয়ে ৬০ জনের বিধানসভায় সরকার বিজেপি-র। নাগাল্যান্ডে ৬০ জনের মধ্যে ১৩ জন বিজেপি-র। সরকার কার? বিজেপি-র। এভাবে ১০টি রাজ্যের সরকার বিজেপি দখল করেছে। গুজরাটে বিজেপি-র সরকার। তবু ১৬ জন বিধায়ক কিনেছে রাজ্যসভায় আসন বাড়াতে। মধ্যপ্রদেশে বিধায়ক-পিছু দর ১৫ কোটি টাকা, রাজস্থানে সেই দর ৩৫ কোটি টাকা বলে অভিযোগ। রাজস্থানের স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে কেনার চেষ্টা এবং তাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সাড়া দেওয়ার মতো আপাত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

নির্বাচন করার মানে কী? জানতে চেয়েছেন দেশের বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। কোনো উত্তর নেই। উত্তর মিলবে ২০২৪-এ। বিজেপি সব সময় ছোটো নেতাদের দিয়ে বলিয়ে বাজার দেখে নেয়। প্রতিক্রিয়া কী? সাক্ষী মহারাজ, সার্থকনামা, বলেছেন, ২০২৪-এর পর দেশে নির্বাচন হবে না। ২০২৪-এও কি হবে? হলে কীভাবে?

নির্বাচন কমিশন কার্যত গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র পক্ষে কাজ করেছে। ইদানিং সর্বোচ্চ আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টে, দিল্লি হাইকোর্ট, গুজরাট হাইকোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট— যেখানেই বিচারপতি সংবিধান মোতাবেক কাজ করেছেন, হয় বদলি অথবা বেঞ্চ পুনর্গঠন হয়েছে। সংবিধান মানা বিচারপতি বাদ।

রাজস্থান সরকার আস্থা ভোট নিতে চায়। রাজ্যপাল সে সুযোগ দেবেন না। আদালতে গেলে আদালত বলে, বিরোধিতার অধিকার আছে। দলত্যাগ আর বিরোধিতা তো এক নয়।

অথচ সরকারের বিরোধিতা করে গুজরাটের আইপিএস সঞ্জীব ভাট, উত্তরপ্রদেশের মানবদরদী শিশু চিকিৎসক কাফিল খান জেলে। প্রশ্ন তুলেছেন ভারভারা রাও, গৌতম নওলাখা, অরুণা রায়, সুধা ভরদ্বাজ— জেলে অথবা গৃহবন্দি।

নির্বাচন কমিশন গঠিত তিন সদস্য নিয়ে। অশোক লাভাসা একজন সম্মানিত সদস্য। মোদী ও অমিত শাহের বক্তৃতা ছিল প্ররোচক। আইন ও বিধিভঙ্গকারী। ক্লিনচিট দেয় কমিশন। আপত্তি তোলেন আরেক নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা। তাঁর আপত্তি শোনা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী তা নথিবদ্ধ করে জানানো উচিত। জানানো হয়নি। কেন? কমিশনের জবাব, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারতো। নির্বাচন কমিশনারের নিরাপত্তা নেই দেশে!!! ভাবা যায়।

অশোক লাভাসার পরবর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যাতে না হতে পারেন চক্রান্ত চলছে। তাঁর মেয়েও আইএএস। তিনি লাদাখে বিজেপি-র বেআইনি সভা আটকে ছিলেন। তাই মিথ্যা অভিযোগে মামলা চলছে। অশোক লাভাসার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা ঠোকা হয়েছে। অশোক লাভাসার বিরুদ্ধেও। আর এর মধ্যেই তাঁকে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কে উপাধ্যক্ষ করে পাঠানোর আদেশ বের হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশন ছেড়ে গেলে বিজেপি-র মঙ্গল। না গেলে অশোক লাভাসাকে পোষা সংস্থাগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করবে!

হয় পথে এসো, নয় ফাঁদে পড়ে ফাঁসি চড়ো। ছাগলের মুখে মুখোশ দরকার! দেশের নেতা মন্ত্রীদের নেই! তাই দেশের ভারি শিল্পমন্ত্রী বলতে পারেন, করোনা ঠেকাতে ভাবিজি পাঁপড় চাই।

আর বিজেপি বাঁচাতে কী চাই? পাঁপড় গণতন্ত্র। ইচ্ছে মতো দুমড়ে মুচড়ে খাওয়া যাবে। ভারত কতদিন এই পাঁপড় গণতন্ত্র সহ্য করে সেটাই দেখার। ধর্মের নামে বিদ্বেষ বিষ নাকি গণতন্ত্র ও পেটের লড়াই বড়ো— দেখা যাক।

আত্মনির্ভর অথবা আত্মবিসর্জন

ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড সংক্ষেপে, আইএসপিআরএল নামে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নাম শুনেছেন? অনেকেই বলবেন শোনেননি। অনেকে চুপ করে থাকবেন। আর কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করবেন, এইরকম কিছু আছে বলে তো শুনিনি। যাঁরা শোনেননি অথবা যাঁদের জানা নেই তাঁদের সকলের জ্ঞাতার্থে শুরুতেই জানিয়ে রাখা দরকার যে ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অধীন আইএসপিআরএল ২০০৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয়। সূচনা পর্বে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির সদর দপ্তর দিল্লির প্রতিবেশী নয়ডা-য় অবস্থিত।

১৯৯০-৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধের পর পেট্রোলিয়াম আমদানিকারী প্রতিটি দেশই বুঝতে পারে নিজস্ব পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় গড়ে না তুললেই নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শুরু হয় আলাপ-আলোচনা। অবশেষে আইইএ অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি জানিয়ে দিল যে তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যারা পেট্রোলিয়াম আমদানি করে তাদের অন্তত ৯০ দিনের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে। ভারতেও শুরু হয় সরকারি স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা। বৈঠকের পর বৈঠক চলতেই থাকে। মাঝে তো কতবার সরকারের পরিবর্তন হল। দেখতে দেখতে বিংশ শতাব্দীই চলে গেল ইতিহাসের পাতায়। অথচ সকলেই উপলব্ধি করতে পারছেন যে আপৎকালীন প্রয়োজনের কথা ভেবে পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর যখন শাইনিং ইন্ডিয়া ঝলমল করছিল তখন প্রস্তাবিত পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের অবস্থান নিয়ে ভারত সরকার আলোচনা-গবেষণা করতে ব্যস্ত। নানারকমের প্রস্তাব। কখনো বলা হচ্ছে দেশের মধ্যে না করে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রে করলে কেমন হয়। কখনো আবার ভাবা হচ্ছে আন্দামান নিকোবরের কথা। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতা। শেষ পর্যন্ত মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত সরকার ২০০৪-এ ঠিক করল যে অনেক হয়েছে আর নয়। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে দেশের নিজস্ব আপৎকালীন পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার। সেই সুবাদেই ২০০৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম নিল আইএসপিআরএল।

ম্যাঙ্গালুরু, বিশাখাপত্তনম এবং কর্ণাটকের উদুপি জেলার পেদুর-এ তৈরি হল ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার। প্রায় ৩৭০ লক্ষ ব্যারেল তেল এই তিন সঞ্চয় ভাণ্ডারে মজুত রাখা যায়। একান্ত প্রয়োজনে দেশের ১০ দিনের চাহিদা এই মজুত তেল মেটাতে পারে। আর দেশের পেট্রোলিয়াম শোধনাগারগুলিতে যে সঞ্চয় থাকে তা দিয়ে ৬৫ দিনের চাহিদা মেটানো যায়। আরো ১৫ দিনের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা দরকার। রাষ্ট্র নির্বিকার। আইইএ নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছে। কিছু একটা না করলেই নয়। ২০১৭-১৮-র বাজেট বক্তৃতায় বলা হয় ওড়িশার চাঁদিখোল-এ একটি নতুন আপৎকালীন পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় ভাণ্ডার তৈরি করা হবে। আর পেদুর-এ একটি নতুন সংরক্ষণাগার সংস্থাপিত হবে। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল এতে আরো ১২ দিনের তেল মজুতের সুযোগ বাড়তে পারে। আইইএ-র নির্দেশ অনুযায়ী আরো তিন দিনের সঞ্চয় ক্ষমতা না বাড়ালে ৯০ দিনের বন্দোবস্ত হচ্ছে না। তখন বলা হল আপাতত এই দিয়েই কাজ চালানো যাক। তৃতীয় পর্যায়ে রাজস্থানের বিকানীর আর গুজরাটের রাজকোট-এ আরো দুটি সংরক্ষণাগার গড়ে তুললেই আইইএ-র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। দেশ আত্মনির্ভর হবে।

বেশ তো, তা না হয় হল। ইতিমধ্যে প্রতিদিনের চাহিদা যে বেড়েই চলেছে তা কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে আনা হল না। কেউ প্রশ্ন করলেন না দেশের তৈলক্ষেত্রগুলির লাগোয়া অসমের নুমালিগড় শোধনাগারের আশপাশের কোনো এলাকায় এইরকম একটি আপৎকালীন পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণাগার কেন গড়ে তোলা হবে না? তাহলে তো আত্মনির্ভরতার পথে হয়তো আরেকটু এগিয়ে যাওয়া যেত।

আইইএ কিন্তু নিয়মিত নজরদারি জারি রেখেছে। এদিকে চাঁদিখোল এবং পেদুর-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে না। অর্থাৎ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা বলে আখ্যা পাওয়া সরকারের তিনটি প্রকল্প ছাড়া কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। আপৎকালীন সময়ের জন্য অশোধিত তেলের মজুত ভাণ্ডার বাড়াতে গেলে যে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে তার জন্য অনেক সময় লাগবে। বড়ো অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। সে কারণেই বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুরু করে ভারত সরকার তাদের ভাণ্ডার ভাড়া নিতে চাইছে, যাতে আপৎকালীন প্রয়োজনের সময় সরবরাহে সমস্যা না হয়। প্রাথমিক আলোচনা মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তা সফল হলে টেক্সাস ও লুইজিয়ানার ভাণ্ডারে তেল রাখবে ভারত। মার্কিন বেসরকারি সংস্থাগুলি এই ধরনের পরিকাঠামো তৈরি করে। ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সেখানে তেল রাখতে শুরু করেছে।

এই ধরনের ব্যবস্থায় সুবিধার পাশাপাশি কয়েকটি ঝুঁকির দিকও রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের সঙ্গেই পরিকাঠামোর ভাড়াও গুনতে হবে ভারতকে। তেল কেনার জন্য দেশীয় সংস্থাগুলিকে আগাম দামও দিতে হবে। ফলে তাদের পুঁজি আটকে থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দেশের লকডাউন। বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি স্তব্ধ থাকলে বা সমুদ্রপথে কোনো সমস্যা তৈরি হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী মজুত ওই তেল দেশে নিয়ে আসা কঠিন। এমনিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে করে অশোধিত তেল ভারতে নিয়ে আসতে মাসাধিক সময় লাগে। অবরোধের আবহে আরো বেশি সময় লাগা অস্বাভাবিক নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মধ্যপ্রাচ্যের থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কিনে মার্কিন মুলুকে সংরক্ষণ করতে পাঠিয়ে এবং প্রয়োজনের সময় দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যে পরিবহন খরচ হবে তার গুণাগার কে দেবে?

এখানেই শেষ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে ইতিমধ্যেই ইরানের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কেনা বন্ধ। ভবিষ্যতে যদি ভারত এমন কোনো দেশের থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কিনতে চায় যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো নয় তাহলে সেই অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখা যাবে তো? ভারতের প্রচলিত বৈদেশিক নীতি থেকে সরে আসার বিষয়ে এ হবে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং একই সঙ্গে মেনে নিতে হবে ভারত কোন দেশের থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কিনতে পারে তা স্থির করে দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এইভাবে দেশকে ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর করে তুলে কি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব?

ছবি : নন্দলাল বসু

অসম আরোহণ-অর্থনৈতিক চলমানতা ও সুযোগের রুদ্ধদ্বার

মৈত্রীশ ঘটক

একটা অর্থব্যবস্থা কতখানি সজীব, কতখানি গতিশীল, তার একটা বড়ো মাপকাঠি এইরকম হতে পারে— সেই অর্থব্যবস্থায় থাকা প্রতিটি মানুষ নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে নিজের স্বপ্নপূরণের কত কাছাকাছি যেতে পারেন। 'মোবিলিটি' বা চলমানতা এমন একটি অর্থনৈতিক সূচক যা দিয়ে বোঝা যায় অর্থব্যবস্থাটি স্থবির না সচল।

অর্থনৈতিক চলমানতার অনেকগুলি দিক আছে। যেমন, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলমানতা; কোনো একটি প্রজন্মের জীবৎকালে চলমানতা; ভৌগোলিক ও পেশাগত চলমানতা; একই পেশার মধ্যে চলমানতা ও এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলমানতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে কোনো একজন মানুষ বা একটি জনগোষ্ঠীর নিজের বা নিজেদের আর্থিক অবস্থার দৃশ্যমান উন্নতিসাধন করতে পারছে কিনা— তা সে নিজের জন্যে হোক কী পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে— তাকেই অর্থনৈতিক চলমানতার সূচক দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই ধারণাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের গুণগত মানের সদর্থক পরিবর্তনের ধারণা জড়িয়ে আছে, যার উদাহরণ হল, দারিদ্র বা সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদশ্রেণি থেকে উঠে এসে শিক্ষাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

তাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্য ধারণাগুলির সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে সচরাচর জাতীয় আয়ের মানের স্তর বা তার বৃদ্ধির হার, অথবা কত সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যরেখার তলায় আছেন, বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য কিংবা মানবসম্পদ বিকাশের সূচক ব্যবহার করা হয়। এই সূচকগুলি হয় স্থাবর, নয়তো পরিবর্তন ধরা পড়ছে যান্ত্রিকভাবে (যেমন, বৃদ্ধির হার)। ঠিক যেমন কোনো মানুষের ওজন বা তার বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের সূচক হিসেবে সন্তোষজনক নয়, সেরকম উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তনের দিক আছে, তা ঠিকভাবে এই সূচকগুলির (যেমন, গড়পড়তা আয়ের মান বা তার বৃদ্ধির হার) দ্বারা ধরা পড়ে না। অর্থনৈতিক চলমানতা উন্নয়নের এমনই এক সচল মাপকাঠি, যা অনেক সময়েই তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায় না।

তবে একই প্রক্রিয়ার (উন্নয়ন) নানা মাপকাঠির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। চলমানতা, আর্থিক বৃদ্ধি, অসাম্য এবং দারিদ্রের মধ্যেও অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু ঘটনা হল, এই বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সোজাসাপটা নয় আর তাই উন্নয়নের একটি আলাদা সূচক হিসেবে চলমানতাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

প্রথমে ধরা যাক অসাম্য ও চলমানতার মধ্যে সম্পর্ক। যে অর্থব্যবস্থায় বৈষম্য প্রচুর, অথবা দারিদ্র বেশি, সেই অর্থব্যবস্থা নিশ্চিতভাবেই স্থবির হবে, তাতে চলমানতার হার কম হবে। তাই যে অসাম্য সুযোগের বৈষম্য তৈরি করে, তা চলমানতার প্রতিবন্ধক এবং তা উন্নয়নের নিক্তিতেও অনভিপ্রেত কারণ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে যে প্রতিভা বা দক্ষতা তার বিকাশ না হলে তাতে শুধু সেই ব্যক্তির নয়, বৃহত্তর সমাজেরও ক্ষতি। তবে বৈষম্য কমলেই চলমানতা বাড়বে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যমের সুযোগ কম, সেখানে চলমানতার সম্ভাবনাও সীমিত।

আবার একথাও সত্যি যে অর্থনৈতিক চলমানতার ফলেও বৈষম্য তৈরি হতে পারে— যেকোনো উদ্যমে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই হতে পারে। একই সুযোগ পেয়ে, একই উদ্যমে পৃথক ফল হতে পারে। তাই যে অর্থব্যবস্থায় উদ্যমের ভূমিকা বেশি সেখানে খানিক আর্থিক বৈষম্য অনিবার্য। এখন সুযোগের অসাম্য আর ফলাফলের অসাম্য সম্পূর্ণ আলাদা দুটো ব্যাপার। এবং অর্থনৈতিক নীতির যে কাঠামো তা এই দুই ধরনের অসাম্যের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করবে সেটাও একটা আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এখানে যেটা মূল বক্তব্য

সেটা হল, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও চলমানতার মধ্যে কোনো সরল সমীকরণ নেই। অসাম্য বাড়লে চলমানতা কমবে সেটা সত্যি। কিন্তু অসাম্য কমলেই চলমানতা বাড়বে তা নয়— তার জন্যে উদ্যমের সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজন। আবার, চলমানতা বাড়লেই অসাম্য কমবে তাও নয়— কারণ, চলমানতার সঙ্গে সাফল্য ও ব্যর্থতার আর্থিক পরিণামের মধ্যে ফারাকও বাড়বে।

একই কথা সত্যি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও চলমানতার মধ্যে সম্পর্কে। অর্থাৎ, একটি বাড়লে আর একটি বাড়বে বা কমবে এরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটা ঠিক যে যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগের প্রসার কম, সেখানে বৃদ্ধির হারও কম হবে এবং বিদ্যমান অসাম্য সচলতাকে দমিয়ে রাখবে। কিন্তু আবার এও সত্যি যে যথেষ্ট আর্থিক বৃদ্ধি হলেও অর্থব্যবস্থায় যথেষ্ট চলমানতা না থাকতে পারে। ধরুন, কোনো অর্থব্যবস্থায় আর্থিক বৃদ্ধি ঘটছে, গড় আয়ের পরিমাণও বাড়ছে (ধরা যাক, বাণিজ্যের সুযোগের প্রসার বা পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে), তাতে গড় জাতীয় আয় বাড়বে, এমন কী সবারই আর্থিক অবস্থার খানিক উন্নতিও হতে পারে। কিন্তু উন্নতির সুযোগের বণ্টনে যদি বৈষম্য থাকে, তা যদি নির্ধারিত হয় জন্মপরিচয়ের মাধ্যমে— সে অর্থনৈতিক শ্রেণি হোক কি জাতপাত বা বর্ণ— তাহলে আপেক্ষিকভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থান একই থেকে যাবে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার বাড়লে চলমানতার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর্থিক উদারীকরণ-পরবর্তী ভারতের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

মোদ্দা কথা হল, বৃদ্ধির হার, সুযোগের সাম্য (বা, দারিদ্র হ্রাস পাওয়া), এবং অর্থনৈতিক চলমানতা এগুলি সবকটিই উন্নয়নের ইতিবাচক বা সদর্থক সূচক— এবং এদের মধ্যে সম্ভাব্য পরিপূরকতা আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কগুলি সরল নয়, তাই প্রত্যেকটি সূচককে আলাদা করে ধরে বিচার করতে হবে। এই লেখাটিতে মনোযোগ থাকবে মূলত চলমানতার ওপরেই।

২

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উন্নয়নের একটি বিকল্প সূচক হিসেবে না হয় ঠিক আছে, কিন্তু সমাজকল্যাণ বা ন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে চলমানতা কেন কাম্য? অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সুযোগের সাম্যের বিস্তার এবং দারিদ্র দূরীকরণ, প্রগতিশীল নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এগুলির ওপর মনোনিবেশ করাই কী যথেষ্ট নয়?

স্পষ্টতই, চলমানতার ধারণার সঙ্গে যোগ আছে মেরিটোক্রেসি বা মেধাতন্ত্রের ধারণাটির। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক চলমানতা থাকলে কেউ কোন জায়গা থেকে উঠে আসছেন, সেটা আর বিবেচ্য হবে না— তাঁর উন্নতির, স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা নির্ভর করবে তাঁর দক্ষতার ওপর, উদ্যমের ওপর, ইচ্ছার ওপর। যোগ্যদের সুযোগ না পাওয়া আর অযোগ্যদের সুযোগ পাওয়া এবং অনর্জিত সাফল্য, মেধাতন্ত্রের দিক থেকে দেখলে দুটিই অনভিপ্রেত।

অর্থব্যবস্থায় চলমানতার উদাহরণ কী হতে পারে? কতগুলি উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন ধরুন, সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মতো প্রতিভা আছে, অথচ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে বা মেয়ে— এমন একজনের পক্ষে সত্যিই নিজের প্রতিভা অনুযায়ী আর্থিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব কি না, সেটা চলমানতার একটা পরীক্ষা। একইভাবে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি ঝুঁকি নিয়ে শহরে আসতে চায়, সেখানে চাকরি বা ব্যাবসা করতে চায়, তার সফল হওয়ার সম্ভবনা কতখানি? প্রতিবার যখন স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় অভাবী কিন্তু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খবর বেরোয়, মতাদর্শ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই খুশি হন।

এই উদাহরণগুলি দেখাচ্ছে যে অভাবের কারণে মেধা বা প্রতিভার অপচয় ন্যায়ের বিচারে কাম্য নয়। আবার বিত্তবান হবার জন্যে অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়া এবং যোগ্য কারোর থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করাও মেধাতন্ত্রের দিক থেকে কাম্য নয়। তাই চলমানতার উদাহরণ হিসেবে একতরফা শুধু যোগ্যদের সাফল্যের বা উত্তরণের ঘটনা দেখলে চলবে না। চলমানতার অন্যপিঠ হল, যারা অযোগ্য তাদের ব্যর্থতা বা আর্থিক অবস্থানে অবনয়ন অনিবার্য।

অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুম্পিটার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্রের সজীবতার উদাহরণ দিতে গিয়ে নতুন প্রযুক্তি, পদ্ধতি, বা ব্যাবসা-বুদ্ধির দ্বারা পুরোনো ধারার পতন বা বিসর্জনকে 'সৃজনমূলক ধ্বংসের' প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। এখন তাঁর বর্ণনার এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাস্তবের মিল নিশ্চয়ই আছে। যেমন, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরিবর্তনের ঢেউ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসে পড়ছে— এক যন্ত্র আর এক যন্ত্রকে অহরহ পেছনে ফেলছে, অনলাইন অনেক পরিষেবা (যেমন, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, হোম ডেলিভারি বা ওলা-উবার) আক্ষরিকভাবে এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। তার ফলে কিছু পুরোনো ধাঁচের ব্যাবসা নিশ্চয়ই ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু এও সত্যি যে বড়ো কিছু বাণিজ্যগোষ্ঠী তাদের

সাম্রাজ্য যেভাবে বিস্তার করে রেখেছে, তাতে প্রযুক্তি বা ব্যাবসার মডেলের যে ঘোড়াই জিতুক, শেষ বিচারে লাভ তাদেরই। তার ওপর কর্পোরেট জগতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা সরকারি ভরতুকি ও সুবিধা তো আছেই। এগুলোর এবং নানা নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের (যেমন, দেউলিয়াপনা-সংক্রান্ত আইন বা যা একচেটিয়া আধিপত্যের বিস্তারে বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আঁচ সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে) মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসাগুলিকে টিকে থাকতে সাহায্য করা এবং বহিরাগতদের প্রবেশের অন্তরায় খাড়া করে রাখা।

তথ্যপ্রযুক্তির জমানায় নতুন কিছু উদ্যোগ বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান (যেমন, ইনফোসিস) যে তৈরি হয়নি তা নয়, কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বড়ো ব্যবসায়ীদের দাপট এবং নতুন উদ্যোগপতিদের প্রবেশের পথে হাজারো প্রতিবন্ধকের কথাও সত্যি, যা চলমানতার পথে প্রত্যক্ষ অন্তরায়।

চলমানতার পথে আরো কী কী প্রতিবন্ধক, তা নিয়ে তলিয়ে ভাবতে হলে ধ্রুপদী মার্কসবাদী অর্থে শ্রেণির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য তো আছেই। তা ছাড়া উদ্যোগে বিনিয়োগের প্রয়োজন আর তার জন্যে বিত্তবান শ্রেণি যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (যেমন, ঋণ পাওয়া) সুবিধাভোগ করে তার সঙ্গে দরিদ্রশ্রেণি থেকে আসা সমান বা অধিকতর গুণসম্পন্ন কোনো মানুষের প্রতিযোগিতা সমানে-সমানে হয় না।

এছাড়া চলমানতার পথে আরো অনেক আপাত-অদৃশ্য অন্তরায় আছে। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু নয়, অর্থনীতি, রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষা জগতে পারিবারিক প্রভাব, সামাজিক সম্পর্কের যে অদৃশ্য কাঠামোতে আমরা আবদ্ধ, তাতে পরিচিতি বা চেনাজানার ভূমিকা অগ্রাহ্য করা যায় না, যা বাইরে থেকে যারা আসে তাদের পথে অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক প্রভাব ফলানো বা স্বজনপোষণ করা যদি নাও হয়, কে কাকে চেনে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক পরিচিতিজনিত বাধা বাদ দিলে, চলমানতার পথে আরও অনেক প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক আছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি— যেমন, জাতিভেদপ্রথা বা লিঙ্গবৈষম্য অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই পরিচিতিগুলির কারণে কারো পক্ষে নিজের অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কঠিন হতে পারে।

মুক্ত-বাজারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতেই পারে— প্রবেশপথের অন্তরায় যদি অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক থেকে ক্ষতিকারক হয়, তাহলে পরিবর্তনমুখী কোনো প্রবণতা কি কাজ করবে না যা এই ক্ষতিটিকে অপসারণ করবে? বাজারে যদি নিম্নমানের কোনো পণ্য বিক্রি হয়, তাহলে উচ্চমানের পণ্য এসে তাকে হটিয়ে দেবে না? এই একই যুক্তি তো সবক্ষেত্রেই খাটার কথা। এই বিষয়টি বিশদ আলোচনা দাবি করে, এখানে সংক্ষেপে দুটি মূল কারণ উল্লেখ করছি কেন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে এরকমটা সবসময় হবে। প্রথমত, বাজার যদি প্রতিযোগিতামূলক না হয়, তাতে একচেটিয়া ক্ষমতার উপস্থিতি থাকে, তাহলে সবসময় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের (বা, সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত) পণ্যের জয় হবে, এরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই, এ অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই থেকেই জানা যায়। দ্বিতীয়ত, পণ্যের বা পরিষেবার গুণমান সবসময় সর্বজনবিদিত হয় না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে। তথ্য যখন অপ্রতুল তখন সুনাম বা পরিচিতির ভূমিকা (যেমন, ব্যাবসার ক্ষেত্রে 'ব্র্যান্ডনেম') গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, তখন নতুন কারোর প্রবেশপথ দুর্গম হয়ে দাঁড়ায়। সূক্ষ্ম হলেও এগুলিও প্রবেশপথের অন্তরায়ের উদাহরণ, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৩

অর্থনৈতিক চলমানতার হার কোনো ধ্রুবক নয়। অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তি ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গে তা পালটাতে বাধ্য। প্রশ্ন করতেই পারেন, ভারতে সাম্প্রতিক অতীতে যে আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তাতে কি দেশে চলমানতার হারও বেড়েছে? এখন ভারতীয় অর্থনীতি মন্দার খপ্পরে পড়েছে বটে, কিন্তু তার আগের কয়েক দশকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছে রীতিমতো চড়া হারে, গড় আয় বেড়েছে, দারিদ্র কমেছে। কিন্তু, কোনো দরিদ্র পরিবারে বা সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত পরিবারে জন্মানো একটি ছেলে বা মেয়ের আর্থিক সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা বেড়েছে কি?

তত্ত্বের জগত থেকে যদি তথ্যের জগতে আসি, এরকম অনেক প্রশ্নই ওঠে। বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে চলমানতার হার নিয়ে কী জানা যায় তা নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে তথ্যভিত্তিক গবেষণা হয়েছে, তার সন্তোষজনক বিস্তারিত আলোচনা এই লেখার পরিধির বাইরে। তাহলেও কিছু প্রাথমিক তথ্য পেশ না করলে আলোচনা নেহাতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে দেখলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমেরিকার কথা, কারণ 'আমেরিকান ড্রিম'-এর ধারণাটি চলমানতার এক জনপ্রিয় উদাহরণ। এর অর্থ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনই এক মুলুক যে, কারো যদি ক্ষমতা থাকে, আর

সে যদি লেগে থাকতে পারে, তা হলে তার আর্থিক উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। মজার ব্যাপার হল, আরো অনেক প্রচলিত ধারণার মতো, এটিরও খুব একটা বাস্তব ভিত্তি নেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ চেটি গত এক দশক ধরে আমেরিকায় চলমানতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাজ থেকে জানা যাচ্ছে দরিদ্র শ্রেণিতে (আয়বিন্যাসে সবচেয়ে তলার ২০ শতাংশ) জন্মানো কোনো শিশুর উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে (আয়বিন্যাসে সবচেয়ে ওপরের ২০ শতাংশ) উঠে আসার সম্ভাবনা অন্যান্য উচ্চ-আয়ের দেশগুলোর তুলনায় কম— কানাডাতে এই সম্ভাবনা ১৩.৫ শতাংশ, ডেনমার্কে ১১.৭ শতাংশ, ব্রিটেনে ৯ শতাংশ, আর আমেরিকায় মাত্র ৭.৫ শতাংশ।[১]

ভারতের ক্ষেত্রে মানব উন্নয়ন সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে চলমানতার হার খুবই কম। যেমন, নিম্ন আয়ের যে পেশাগুলি, সেখানে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে পেশা, আয় বা শিক্ষাগত উন্নতির হার খুবই সীমিত— কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের ৫০ শতাংশ ওই একই পেশায় থেকে যান।[২] এই একই সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে অন্য একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, উদারীকরণের পরে গড় আয় বেড়েছে কিন্তু আয় বা শিক্ষার বিন্যাস যদি দেখি, সেখানে চলমানতার হারের বৃদ্ধির প্রমাণ খুব একটা নেই— আগের প্রজন্মের যে আপেক্ষিক অবস্থান তা পরের প্রজন্মে প্রায় একইরকম দেখা যাচ্ছে।[৩] তার মানে চলমানতার কোনো প্রমাণ বা উদাহরণ নেই তা নয়, কিন্তু এই হারের পরিবর্তন সারা দেশের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে দেখলে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নগরাঞ্চলে বা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চলমানতার হার তুলনায় বেশি দেখা যাচ্ছে।

তবে চলমানতার প্রবণতা বুঝতে গেলে এরকম বড়ো ক্যানভাস ছেড়ে আরো ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্তি বা পরিবারগত স্তরের পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করা প্রয়োজন। তার থেকে পাওয়া যেতে পারে এই সব প্রশ্নের উত্তর— চলমানতার নির্ণায়ক হিসেবে কোন কোন উপাদানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? কী কী নীতি দিয়ে আমরা চলমানতার হারকে বাড়াতে পারি? ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

তথ্যসূত্র

১. https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2018/01/11/raj-chetty-in-14-charts-big-findings-on-opportunity-and-mobility-we-should-know/

২. Motiram, S. and A. Singh (2012): “How Close Does the Apple Fall to the Tree? Some Evidence from India on Intergenerational Occupational Mobility”, Economic & Political Weekly, October 6, 2012, Vol XLVII, No 40.

৩. https//www.dartmouth.edu/~novosad/anr-india-mobility.pdf

ছবি : নন্দলাল বসু

অক্সফোর্ডের কোভিড টিকা: কিছু আশা, কিছু প্রশ্ন

স্বপন ভট্টাচার্য

২০ জুলাই ২০২০ তারিখটিকে কোভিড সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকে, হয়তো বা, একমাত্র ভালো দিন বলে গণ্য করতে হবে। ওইদিন সারা গিলবার্টদের ভ্যাকসিন ট্রায়ালের ১/২ পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট প্রকাশিত হল ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সবথেকে মান্য জার্নাল 'ল্যান্সেট'-এ[১]। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড জেনার ইনস্টিটিউটের প্রফেসর অ্যানড্রু পোলার্ডের নেতৃত্বে সারা গিলবার্টরা কোভিড ভ্যাকসিনের জন্য সাড়া জাগানো খবর হয়েছিলেন সংক্রমণের শুরুতেই। এঁদের ভ্যাকসিনটির ল্যাবরেটারি নাম 'ChAdOX1 nCoV-19' (AZD1222) এবং এটি ভেক্টর বাহিত উপাদান। ভেক্টর হিসেবে এখানে নেওয়া হয়েছে শিম্পাঞ্জির শরীর থেকে আহৃত Adenovirus এর RD (Replication Deficient) প্রকরণ।

শিম্পাঞ্জির অ্যাডেনোভাইরাস এমনিতে মানুষের শরীরে সামান্য প্রতিক্রিয়া ঘটালেও ঘটাতে পারে, কিন্তু এই ভাইরাসকে টিকাকরণের কাজে ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলার কাজ সারা গিলবার্টরা করেছেন জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। প্রথমত, এটাকে সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে করোনাভাইরাসের জিন যা মানুষের কোষে প্রবেশ করে প্রকাশিত হলে সে কোষ তৈরি করবে স্পাইক প্রোটিন। স্পাইক হল SARS Cov2-এর আবরণীর গায়ে সংযুক্ত কাঁটার মতো প্রোজেকশনগুলো যা এই ভাইরাসের গোত্রচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মানে এই 'জেনেটিক্যালি মডিফায়েড' অ্যাডেনোভাইরাস দ্রবণকে টিকা হিসেবে ব্যবহার করলে গ্রাহকের শরীরে SARS Cov2 স্পাইক অ্যান্টিজেন তৈরি হবে কিন্তু অ্যাডেনো বা করোনা কোনো ভাইরাসেরই সংখ্যাবৃদ্ধি হবে না।

মে মাসের ১৫ তারিখে এর প্রাণি-মডেলের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)-এর অন্তর্গত Hamilton, Montana স্থিত Rocky Mountain Laboratories-এ ছয়টি ভ্যাকসিনপ্রাপ্ত বাঁদরের সঙ্গে তিনটি কন্ট্রোল (ভ্যাকসিন ছাড়াই সংক্রামিত) বাঁদরের তুলনা করে দেখা গিয়েছিল টিকাকরণের ফলে তাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়াই কেবল নয়, অনাক্রম্যতা অর্জনের দরুণ এদের ফুসফুসে SARS Cov2 বাড়তে পারেনি এবং ফুসফুসে সংকমণজনিত ক্ষতি বা পচন হয়নি যা টিকার সুযোগ পাওয়া জীবগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে।

এবার ল্যান্সেটে ২০ জুলাই প্রকাশিত হল টিকার ১/২ পর্যায়ের রিপোর্ট। ১/২ ট্রায়াল হল দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল যেখানে টিকার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফেজ-২-এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে স্বেচ্ছাগ্রাহী মানুষের ওপর টিকার সেই ডোজই দেওয়া হয় যা আসলে প্রথম পর্যায়ের সর্বোচ্চ ডোজ যা কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এক হিসেবে ১/২ ফেজের ট্রায়াল হল ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমন্বয়ে একটা যৌথ ট্রায়াল।

পাঠকদের সুবিধার্থে, যেই পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের পরীক্ষা হল সেগুলিকে এক এক করে সাজিয়ে দেওয়া যাক:

ক. ২৩ এপ্রিল থেকে ২১মে ২০২০ পর্যন্ত ১০৭৭ জন স্বেচ্ছাগ্রাহীর উপর যে পদ্ধতিতে এই ট্রায়াল হয়েছিল তাকে বলে 'সিঙ্গল ব্লাইন্ড র‍্যান্ডমাইজড ট্রায়াল'। এর অর্থ যারা নিরীক্ষক তাঁরা জানতেন কিন্তু যারা স্বেচ্ছাগ্রাহী তারা জানতেন না কে সঠিক টিকা পেয়েছেন আর কে পেয়েছেন হুবহু টিকার মতো নমুনা যা আসলে নকল। নকল টিকার কোনো নিরাময়কারী ভূমিকা নেই আবার কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়াও নেই। ব্রিটেনের পাঁচটি স্থানে এই ট্রায়াল সম্পন্ন হয়। এগুলি হল যথাক্রমে— i) Centre for Clinical Vaccinology and Tropical Medicine, University of Oxford ii) NIHR Southampton Clinical iii) Research Facility, University Hospital, Southampton, NHS Foundation Trust, iv) Imperial College London, St

Georges University of London and University Hospital NHS Foundation Trust v) University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust.

খ. এই পরীক্ষায় স্বেচ্ছাগ্রাহীদের বেছে নেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন দিয়ে। এদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫'র ভিতরে (গড় বয়স ৩৫) এবং এদের ভিতরে নারী পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান (৪৯.৮ শতাংশ নারী এবং ৫০.২ শতাংশ পুরুষ) যদিও বর্ণসাম্য আছে বলা যাবে না কেন না ৯০.৯ শতাংশ ভলান্টিয়ারই শ্বেতকায়। দেখে নেওয়া হয়েছে এদের কোনো সারস-কভ-২ (SARS Cov2) ঘটিত কোভিড ১৯ রোগলক্ষণ ছিল না বা নেই। এছাড়া পরিপূর্ণ মেডিক্যাল রেকর্ড যেমন, রক্তে শর্করা, লিপিড প্রোফাইল, কিডনির অবস্থা, গর্ভাবস্থা, হেপাটাইটিস B ও C সংক্রমণ ও এইডস ঘটিত ইতিহাস এইসব দিক থেকে নীরোগ ও সুস্থ মানুষদেরই নির্বাচিত করা হয়েছে এই ট্রায়ালের জন্য। যারা কোভিডে আক্রান্ত হয়েও সেরে উঠেছেন এবং যারা সামনের সারিতে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী— তাদের এই পরীক্ষায় সামিল করা হয়নি। না করার কারণ এদের ভিতরে অ্যান্টিবডি হয় তৈরি হয়ে গেছে অথবা অ্যাসিম্পটোমেটিক সংক্রমণের কারণে তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে শরীরে। অর্থাৎ অ্যান্টিবডি যদি তৈরি হয় তাহলে সেটা যেন কেবল টিকার কারণেই হয় তা সুনিশ্চিত করেই এই পরীক্ষায় নামা হয়েছে।

গ. স্বেচ্ছাগ্রাহীদের সমান দুভাগে (১:১ অনুপাতে) ভাগ করে নিয়ে একদলকে নিরাময়কারী টিকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্ণিত শিম্পাঞ্জি অ্যাডেনোভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম ChAdOx1 nCoV-19 টিকা। অ্যাডেনোভাইরাস হলেও এরা জিনপ্রযুক্তিজাত বলে বহিরাবরণীতে SARS Cov 2-ভাইরাসের মারক অস্ত্র স্পাইক প্রোটিন তৈরি করতে পারে তা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় দলকে দেওয়া হয়েছে মেনিনজোকক্কাস কনজুগেট ভ্যাকসিন (MenACWY) যা আদপেই কোনো ভাইরাস নয়, বরং ব্যাকটেরিয়াজাত এবং নির্বিষ। তবে বলার কথা হল এই যে, ইনজেকশনের মাধ্যমে টিকা নিলে ফোলা বা ব্যথা বা হালকা জ্বর ইত্যাদি যা যা উপসর্গ আসল টিকা দেখাবে, নকলও তার ব্যতিক্রম হলে চলবে না। বুঝে দেখুন, টিকা তৈরির পদ্ধতিটায় মানদণ্ড ঠিক কতটা নিখুঁত হওয়া দরকার। পরীক্ষায় ব্যবহৃত এই নকল ভ্যাকসিনকে পরীক্ষার নিরিখে বলে 'কন্ট্রোল'। আসল টিকা ChAdOx1 nCoV-19 প্রাপ্ত স্বেচ্ছাগ্রাহীর সংখ্যা ছিল ৫৪৩ (n=543) এবং নকল টিকা MenACWY নেওয়া স্বেচ্ছাগ্রাহীর সংখ্যা ছিল ৫৩৪ (n=543)

ঘ. প্রত্যেককে মাংসপেশিতে ইনজেকশন হিসেবে হয় এক একবারে ৫০০০০০০০০০০ ($5x10^{10}$)-টি অ্যাডেনোভাইরাস কণিকা নতুবা ০.৫ মিলিলিটার নকল টিকার দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'ব্লাইন্ড' পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল বলে কেউই জানত না কে আসল পেল আর কে নকল। ভলান্টিয়ারদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম গ্রুপের গ্রহীতাদের যথাক্রমে ৩,৭,১৪,২৮ ও ৫৬ দিন পরে শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাপার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের সদস্যদের টিকাদানের পর রক্তে T cell ঘটিত এবং অ্যান্টিবডিঘটিত ইমিউনিটি মাপার ব্যবস্থা ছিল। চতুর্থ গ্রুপের সদস্যদের কেবল অ্যান্টিবডি-ঘটিত ইমিউনিটি মাপা হয়েছে, তাই পুরো রক্ত নয় বরং সেরাম সংগৃহীত হয়েছে এদের দেহ থেকে। তৃতীয় গ্রুপের ট্রায়ালই কেবল নন-র‍্যান্ডম। এই গ্রুপে দশ জন এমন স্বেচ্ছাগ্রাহী ছিলেন যারা 'ব্লাইন্ড' নন অর্থাৎ এরা জানতেন পরীক্ষামূলক টিকাই পাচ্ছেন। এটা করা হল এই জন্য যে এরা টিকার দ্বিতীয় ডোজ বা বুস্টার ডোজও পাবেন প্রথম ডোজের ২৮ দিন পরে এবং এদেরও প্রথম গ্রুপের মতো ৩ থেকে ৫৬ দিনের মধ্যে ব্যাপক শারীরিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

ঙ. পাঁচটির মধ্যে দুটি স্থানের স্বেচ্ছাগ্রাহীদের টিকা দেবার আগেই জ্বর কমানোর ওষুধ প্যারাসিটামল দেওয়া হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল প্যারাসিটামলের সঙ্গে টিকার কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা তা দেখার জন্য। এই দুই জায়গার নকল ও আসল টিকাপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারকেই টিকা দেবার পরের ২৪ ঘণ্টা পর পর ১ গ্রাম প্যারাসিটামলের (Paracetamol 1000 mg) একটা করে ট্যাবলেট নিতে বলা হয়েছিল।

চ. রক্তে করোনাভাইরাসের (SARS Cov2) স্পাইক প্রোটিনকে প্রশমনকারী অ্যান্টিবডির মাত্রা প্রত্যেক ভলান্টিয়ারের রক্তে মাপা হয়েছে টিকা প্রয়োগের দিন (০ দিন) এবং ২৮ দিন পরে ELISA পদ্ধতিতে। ঘোষণা করা হয়েছে এই পরিমাপ নেওয়া হবে ১৮৪ ও ৩৬৪ দিনের মাথায়। প্রত্যেক ভলান্টিয়ারকে টিকা পরবর্তী ২৮ দিন ধরে ইলেকট্রনিক ডায়েরিতে শরীরের

যে কোনো অস্বাভাবিকতা রেকর্ড করতে বলা হয়েছিল। যে ডাক্তারদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে দেখে ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারাও 'ব্লাইন্ড' অর্থাৎ আসল টিকা নেওয়া ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত মনযোগী হবার সুযোগ তাদের ছিল না।

ছ. এই টিকার অনাক্রম্যতা প্রণোদিত করার ক্ষমতা সম্পর্কে বলবার আগে যে কথাটা বলে নেওয়া দরকার তা হল, আমাদের শরীরের অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির দুটো বাহু। একটা বাহুর নাম হিউমোরাল ইমিউনিটি (Humoral Immunity) এবং এটা প্রকাশিত হয় নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে। অপর বাহুটিকে বলে সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি (Cell Mediated Immunity) যা প্রকাশিত হয় রক্তের বিশেষ শ্বেতকনিকা T-লিম্ফোসাইট মাধ্যমে। এই টিকা কোভিডের স্পাইক অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট T-লিম্ফোসাইট উৎপাদনে শরীরকে প্রণোদিত করতে পারলো কিনা তা দেখা হয়েছে ইন্টারফেরন নামক একটা অনুসারী যৌগকে ELISpot পদ্ধতিতে মেপে (interferon-y enzyme-linked immunospot)। হিউমোরাল ইমিউনিটি যে মাপা হয়েছে ELISA পদ্ধতিতে অ্যান্টিবডি মেপে তা তো আগেই বলা হয়েছে। শরীরে মুখ্য অ্যান্টিবডি হল Immunoglobulin G (IgG) প্রকৃতির এবং মাপা হল সেটাই।

জ. এই টিকা সক্রিয় SARS Cov2-কে প্রশমিত করতে পারে কিনা তাও দেখা হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে ভাইরাসে আক্রান্ত মনুষ্যকোষের আস্তরণের উপর এই টিকার দ্রবণ প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রেও কিছু মনুষ্যকোষ এমনও নেওয়া হয়েছিল যা আসল করোনা নয় কৃত্রিম করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। প্রাপ্ত সমস্ত ফলাফলকে তুলনা করে দেখা হয়েছে SARS Cov2 সংক্রমণের পর সেরে ওঠা রোগী এবং আসিম্পটোম্যাটিক ডাক্তার-নার্সের দেহ থেকে প্লাজমা নিয়ে বিশ্লেষণ করে।

ফলাফল

টিকা সংক্রান্ত যে কোনো ট্রায়ালের ফলাফলকে দেখতে হবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের নিরিখে[২], এগুলি হল যথাক্রমে সেফটি বা নিরাপত্তা, এফিকেসি বা কার্যকারিতা এবং মেমরি বা স্মৃতি। এখানে স্মৃতি অবশ্য কার্যকারিতারই অপর রূপ যা নির্ধারণ করে টিকার একটি ডোজ কতদিন পর্যন্ত দেহকে অনাক্রম্যতা দিতে পারবে। এই বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়:

১. টিকা প্রাথমিকভাবে নিরাপদ। প্রথম দলের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া নজরে এসেছে তা হল শরীরে ব্যথা ও জ্বরভাব, মাথাধরা, হঠাৎ শীত করা ইত্যাদি। এর সম্ভাব্যতা ৫ শতাংশের এর থেকেও কম (p=<0.05) এবং এই সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্যারাসিটামল প্রয়োগ করেই সমাধান করা গিয়েছে। করো মধ্যেই কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বলার কথা এই যে, নকল টিকা নেওয়া ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার তুলনায় এই টিকা নিয়ে প্রতিক্রিয়া একটু হলেও বেশি হয়েছে, কিন্তু সেটা যাকে বলে ম্যানেজ করার মতো।

২. ChAdOx1 nCoV-19 প্রাপ্ত ভলান্টিয়ারদের মধ্যে র‍্যান্ডম রক্তপরীক্ষা করে করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন প্রশমনকারী অ্যান্টিবডি (IgG) ঘনত্ব মাপা হয়েছে। দেখা গেছে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ২৮ দিন পরে এই অ্যান্টিবডি ঘনত্ব চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছোয় এবং ৫৬ দিন পর্যন্ত এই ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উপস্থিত। এক্ষেত্রে যারা প্যারাসিটামল নিয়েছিল এবং যারা নেয়নি তাদের মধ্যে কোনো হেরফের হয়নি। যে 'নন-ব্লাইন্ড' ১০ জনের গ্রুপকে ২৮ দিনের মাথায় বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছিল তাদের সবার দেহেই রিপোর্ট করার সময়ে ৫৬ দিন পরে এই অ্যান্টিবডি ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতেও দেখা গেল। ৩৫ জনের শরীর থেকে প্লাজমা নিয়ে সেই প্লাজমা দিয়ে SARS Cov2 আক্রান্ত কোষের ধ্বংসের হার কমানো যায় কিনা সেই পরীক্ষাও হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩২ জনের প্লাজমা একটিমাত্র ডোজের পর এবং ৩৫ জনই দুটি ডোজের পর এই সক্ষমতা অর্জন করেছিল।

৩. অনাক্রম্যতার দ্বিতীয় বাহু সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটিও এই টিকা দ্বারা প্রণোদিত হতে দেখা গেছে। সুনির্দিষ্ট T-কোষের উপস্থিতি সর্বোচ্চ স্তরে যায় টিকা নেবার ১৪ দিন পরে এবং ৫৬ দিন পরে হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও থেকে যায়। বলাই হয়েছে মানুষের শরীরের অনাক্রম্যতার বাহু হল দুটি এবং বোঝা দরকার যে এই দুই বাহু একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। গবেষকদের প্রাপ্ত এবং ঘোষিত ফলাফল থেকে জানা যাচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরির হার এবং T-কোষ দ্বারা সক্রিয় 'লাইভ' ভাইরাস প্রশমনের হার পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সীমাবদ্ধতা

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত পরীক্ষা ও ফলাফলের ভিত্তিতে যে সমস্ত দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলি এইরকম:

- এখন পর্যন্ত নিরীক্ষণের সময় যা পাওয়া গেছে তা এক কথায় সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘমেয়াদী অনাক্রম্যতা যে কোনো টিকারই প্রাথমিক শর্ত। এই ভলান্টিয়ারদের আগামী একবছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রেখে দেখা হবে এদের রক্তে অ্যান্টিবডি মাত্রা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্থায়ী হচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় যে আরো মাস ছয়েক পরে টিকাপ্রাপ্তদের সংক্রমণ হার একই রকম সংক্রমণপ্রবণ পরিবেশে যারা টিকা পাননি তাদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম তখন হয়তো নিশ্চিভাবে কিছু বলা যাবে। মনে রাখবেন, T-কোষ প্রণোদিত 'লাইভ' ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন পরীক্ষা হয়েছে 'এক্স-ভিভো' পদ্ধতিতে দেহের বাইরে পরীক্ষাগারে কালচার্ড কোষস্তরে। তার মানে শরীরের ভিতরেও তা করতে পারা গেছে—এটা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা হয়নি।
- দশজনকে নিয়ে যে প্রাইম বুস্ট গ্রুপ গঠন করা হয়েছে তা সংখ্যার নিরিখে অপ্রতুল। পরবর্তী পর্যায়ে এই বুস্টার ডোজ প্রাপ্তদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়াবেন তাঁরা।
- এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বয়ঃসীমা ১৮ থেকে ৫৫। খুব কম বা খুব বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া জানার অবকাশ হয়নি। এটা অপ্রত্যাশিত নয় অন্তত প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে, কেন না বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে কিনা তা যখন জানা নেই তখন দুর্বল ইমিউনিটির সম্ভাবনা আছে এমন ভলান্টিয়ারদের এই পর্যায়ে সামিল করা বিপজ্জনক হতেও পারতো। পরের পর্যায়ে নিশ্চয়ই বয়ঃসীমা আরো বিস্তৃত করা হবে।
- জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এই ট্রায়াল এখনও হয়নি, কেন না ৯০ শতাংশ ভলান্টিয়ারই শ্বেতকায় ইউরোপিয়ান। সুতরাং বর্ণ, জাতি এবং ভৌগোলিক বৈচিত্রের নিরিখে এই টিকা যে সার্বজনীন তা বলা যাচ্ছে না এখনও।
- টিকাপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ারদের দেহে অ্যান্টিবডি গঠিত হয়ে যাবার পরে SARS Cov2 সংক্রমণ হলে সত্যিই তা অনাক্রম্যতা দিতে পারে নাকি তা যাচাই করে দেখা হয়নি। অনেক সময় এটাও হয় যে, টিকাপ্রাপ্ত শরীরকে ভাইরাসের পক্ষে দখলে আনা আরো সহজ হয়ে দাঁড়ায়। একে বলা হয় 'অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট'। বিশেষ করে ভাইরাস যদি ইতিমধ্যে মিউটেটেড হয়ে যায় তাহলে টিকার কারণে সংক্রমণ কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে। সুতরাং টিকার কার্যকারিতা ভাইরাসের বিকলনহীন থাকার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল।
- সিংগল ব্লাইন্ডেড পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা তো আছেই। রোগী না জানলেও ডাক্তার জানে কে আসল টিকা পেল আর কে নকল। ফলে তারা যে একেবারে নিরপেক্ষ একথা বলা যায় না।

আর কতদিন?

ফলাফল আশাব্যঞ্জক। কিন্তু আশা করবেন না কাল বাদে পরশু থেকে ভ্যাকসিন বাজারে এসে যাবে। এই যে পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল সারা গিলবার্টরা প্রকাশ করেছেন তা ১/২, মানে ১ এবং ২ পর্যায় সংযোজিত করে একটা মিশ্র ট্রায়াল। এই ফলাফল ভ্যাকসিনটাকে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে যে ফলাফল নিয়ে পৌঁছে দিল তাকে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় টেস্টে নামার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু এই সিরিজ ২-১ হওয়া মানেও পরাজয়। তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা এখন চলছে। ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং জনজাতিদের মধ্যে এই পর্যায়ের কাজ চলছে। এই পর্যায়ে স্বেচ্ছাগ্রাহীদের বয়সের পরিসর বাড়ানো হবে এবং শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই ভ্যাকসিনটির বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বহুজাতিক AstraZeneca ল্যাবের সঙ্গে মৌ সাক্ষরের কাজও সম্পন্ন করেছে। উৎপাদনে আসার পর ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটেরও এই টিকার অন্তত দশ কোটি ডোজ পাওয়ার কথা[৩]।

তথ্যসূত্র

১. www.thelancet.com Published online July 20, 2020 https://doi.org/10.1015/S0140-6736(20)31604-4

২. স্বপন ভট্টাচার্য (২০২০) http://www.arekrakam.com/arek-rakam/news-list/details/16 june essay01.php

৩. https:\\health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/serum-institute-investing-usd-100-million-on-potential-covid-19-vaccine/76291628

দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্ব

অভিজিত গুহ

মুখবন্ধ

ভারতে দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্বের ভূমিকা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি। পশ্চিমে ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান কিংবা আমেরিকান নৃতত্ত্বের কথা শোনা যায়। অবশ্যই ইউরোপীয় দেশগুলির নৃতত্ত্বের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রভুত্বের একটা সম্পর্ক আছে। আমেরিকায় অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে আমেরিকান নৃতত্ত্ব। ভারতে, বিশেষ করে স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান নৃতত্ত্বের প্রভাব এতটাই যে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকরা নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করতেই বিস্মৃত হয়েছেন। ফলে দেশ কিংবা জাতি গঠনে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আত্মসচেতনতা সম্পৃক্ত গবেষণা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। অথচ দেশ গঠনের বৃহত্তর পটভূমিকার উপর দাঁড়িয়েই স্বাধীন ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ব বিষয়টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ফলত স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের দেশ গঠনে আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল কিনা সেটা জানার জন্যই নৃতত্ত্বের অতীত অনুসন্ধান দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে সেরকম একটা চেষ্টাই করেছি।

জাতি গঠনে নৃতত্ত্ব: বসু ও শ্রীনিবাস

প্রকৃতপক্ষে ভারতে দেশ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত পণ্ডিতি আলোচনায় নৃতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্বন্ধে কোনোরকম উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকী ভারতীয় নৃতত্ত্বের এক দিকপাল নির্মল কুমার বসুও এ সম্পর্কে প্রায় কোনো আলোকপাত করেননি। বসু শুধু একজন নৃতাত্ত্বিক ছিলেন না, উনি একসময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তাছাড়া বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের (Anthropological Survey of India) পরিচালকও (Director) ছিলেন। বসু ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের সমস্যা সম্পর্কে দুটি বই লেখেন। গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি বই-এর কোথাও তিনি উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানে নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেননি। এর কয়েক বছর আগে ১৯৬২ সালে নির্মলবাবু ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের পত্রিকায় ভারতে জাতীয় ঐক্যের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে বসু জাতীয় ঐক্যের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে গান্ধীবাদী বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেন। উক্ত প্রবন্ধেও তিনি দেশ গঠনে নৃতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। জীবনের শেষপর্বে এসে নির্মলবাবু তাঁর ১৯৭৪ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে জাতি ও দেশ গঠনে নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন। বসুর ভাষায় শোনা যাক :

> একজন নৃতাত্ত্বিক দাবা খেলার শুধু দর্শক নন। ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিকের অনেক বৃহৎ ও গভীরতর দায়বদ্ধতা আছে। তিনি যা দেখেন তার থেকেই শেখেন এবং সেই জ্ঞানকে দেশের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে পৌঁছোবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই নৃতাত্ত্বিকের কর্তব্য হওয়া উচিত। নৃতাত্ত্বিকরা তাদের উচ্চতর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি ও সমন্বয়ী চিন্তার সাহায্যে জাতি ও দেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নেতৃবর্গকে অসাম্য ও অবিচার দূরীকরণে পথ দেখাতে পারেন। এবং ঠিক এই জায়গাতেই দেশ গঠনের কাজে নৃতত্ত্ব অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে দায়বদ্ধ। (বসু ১৯৭৪, পৃ. iv)

ভারতীয় নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আর একজন পথিকৃৎ এম. এন. শ্রীনিবাস দেশ ও জাতি গঠনে সামাজিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে ১৯৭৬ সালে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস ভারতবর্ষের মতো বিশাল উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব ও জটিলতা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের বোধগম্যতা সম্পর্কে

তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস অবশ্য পরবর্তীকালে এম. এন. পানিনির সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত একটি প্রবন্ধে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের যে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে একথা উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে ওঁরা সমাজবিজ্ঞানের উপর জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মের একটা প্রভাবও লক্ষ্য করেন। কিন্তু ওই একই প্রবন্ধে আমরা উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন, বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ এবং বৃহৎশিল্প ও অতিকায় নদীবাঁধ প্রকল্পগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে জনবসতিরগুলির ব্যাপক উচ্ছেদ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকদের অবদান বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাই না। অথচ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে উক্ত তিনটি সমস্যাই ছিল দেশ গঠনের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কয়েকজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক এই বিষয়গুলি নিয়ে ৫০ এবং ৬০-এর দশকেই গভীরভাবে নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে অনুসন্ধান করেছিলেন। নির্মল কুমার বসু এবং এম. এন. শ্রীনিবাস এদের দুজনের কাছ থেকে দেশ তথা জাতি গঠনের কাজে তদানীন্তন নৃতাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বসু এবং শ্রীনিবাসের পরবর্তী প্রজন্মের সুবিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক গোপাল সরনের ‘The study of the Nation Building Process’ (১৯৭৪) প্রবন্ধে আমরা কিছু তত্ত্বের উল্লেখ পাই বটে কিন্তু জাতি গঠনে নৃতত্ত্বের আশাবাদী ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য ছাড়া সরনের প্রবন্ধে আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না (সরন ১৯৭৪)।

দুর্ভিক্ষ, উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন ও উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ

জাতি, দেশগঠন ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের আলোচনায় দেশ গঠনে নৃতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিকদের অবদান নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই হয়নি। মূলত ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা ভারতে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণাভিত্তিক আলোচনা করেছেন সেগুলি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা, সুশীল সমাজ, সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ, বিশ্বায়ন ও জাতীয়তাবাদ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ও আম্বেদকরের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ইত্যাদির মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। দেশ গঠন ও স্বাধীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানে নৃতাত্ত্বিকরা কী করেছিলেন সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী এমনকী নৃতাত্ত্বিকদের লেখাপত্রের মধ্যেও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরেই ভারতের নীতি প্রণেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের সামনে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি হাজির হয়েছিল সেগুলি হল: ১. দুর্ভিক্ষ, ২. দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন এবং ৩. বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠা ও অতিকায় নদীবাঁধ তৈরির ফলে হাজার হাজার মানুষের উচ্ছেদ। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা প্রাপ্তিরকালে এবং তার পরে উপরিউক্ত তিনটি সমস্যা তদানীন্তন রাষ্ট্রনেতাদের সামনে যে বিশাল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলিই ছিল দেশগঠনের প্রধান কাজগুলির অন্যতম। নৃতাত্ত্বিকরা কী এই তিনটি প্রধান সমস্যা নিয়ে চিন্তাভবনা বা গবেষণা করেছিলেন? তদানীন্তন সরকার কী উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের নিযুক্ত করেছিলেন? নৃতাত্ত্বিকরা কী ওইসব বৃহৎ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন? বর্তমান প্রবন্ধে আমি উপরের প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজব। কিন্তু তার আগে নৃতাত্ত্বিকদের কাজকর্ম সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

দেশ গঠন বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা

দেশ গঠন কিংবা জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনা একটা বিশাল প্রেক্ষাপট দাবি করে। ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বৃহৎ প্রেক্ষাপটে ভারতে অভ্যস্ত। উনিশ শতকের নবজাগরণ বা গণতন্ত্রে ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে যখন ঐতিহাসিক কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গবেষণা করেন তখন তাঁর আলোচনার ক্ষেত্রটি কোনো একটি গ্রাম বা কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশ বা জাতি গঠনের আলোচনায় তাই ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খুব একটা অসুবিধে বোধ করেন না। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিকদের কথা ভাবুন। নৃতত্ত্ব এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে একটি বা দুটি আদিবাসী সমাজ অথবা জাতি ব্যবস্থাভিত্তিক একটি গ্রামের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একজন বা দুজন নৃতাত্ত্বিক দীর্ঘস্থায়ী পর্যবেক্ষণের ফলে যে জ্ঞান অর্জন করতেন তারই বর্ণনা ও বিচার বিশ্লেষণ করাটাই হয়ে উঠেছিল এই অদ্ভুত বিষয়টির প্রধান উপজীব্য। পদ্ধতিগত দিক থেকেও নৃতাত্ত্বিকের পক্ষে দেশ বা জাতি গঠনের মতো বৃহৎ ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করাটা খুব একটা সুবিধাজনক ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। দেশের অল্পসংখ্যক আদিবাসীগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও বড়ো জোর তাদের উন্নয়ন ঘটিয়ে কীভাবে এদের স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করা যায় নৃতাত্ত্বিকরা হয়ে উঠেছিলেন তারই একনিষ্ঠ কর্মী ও ভাবুক। খুব স্বাভাবিকভাবেই যে সমস্ত অর্থনীতিবিদরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন সেখানে নৃতত্ত্ব তথা নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণার ভূমিকা প্রায় ছিল না বললেই চলে। নৃতাত্ত্বিকরাও স্বাধীনতা উত্তর যুগে নিজেদের আদিবাসী-বিশারদ হিসেবেই দেখতে বেশি পছন্দ করতেন। দেশ বা জাতি গঠনে নৃতাত্ত্বিকদের চিন্তাভাবনা ও অধিকাংশ গবেষণা আদিবাসী কিংবা ভারতীয় গ্রাম সমাজের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ভারতে নৃতত্ত্বের ইতিহাস রচয়িতারাও

দেশ বা জাতি গঠনে নিয়োজিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি।

উপরোক্ত আলোচনার অর্থ অবশ্য এই নয় যে দেশ গঠনের শুরুতে নৃতাত্ত্বিকদের কোনো অবদানই ছিল না। এবার আমরা দেশ গঠনে নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা ও অবদান নিয়ে আলোচনা শুরু করব।

দেশ গঠনে নৃতত্ত্বের ভূমিকা

ভারতের নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের বৈজ্ঞানিক মুখপত্র Human Science পত্রিকার ১৯৮৬ সালের একটি সংখ্যায় 'ভারতীয় নৃতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৯৫১ সালের তিনটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি দেশ গঠন তথা জাতীয়স্তরে পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই তিনটি ঘটনা হল যথাক্রমে: ১. জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিয়োজিত প্রকল্পে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োগ, ২. পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা গঠনে নৃতত্ত্বের প্রয়োগ এবং ৩. সরকারি স্তরে তপশীলিজাতি ও আদিবাসীগোষ্ঠী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য আলাদা দপ্তরের সৃষ্টি। ওই একই বছরে ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ ও ভারতীয় নৃবিজ্ঞান সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে দিল্লিতে একটি জাতীয় আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভার শিরোনাম ছিল: 'জাতির সেবায় নৃতত্ত্ব'। সভায় ২২টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল এবং ১৯৮৭ সালে 'নৃতত্ত্ব, উন্নয়ন ও জাতি গঠন' শীর্ষক একটি গ্রন্থে ওই ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন অধ্যাপক এ. কে. কাল্লা ও কুমার সুরেশ সিং। বইটির মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয় জানিয়ে দেন যে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নৃতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম এবং বইটিতে ওরা এই বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের আধুনিকতম গবেষণাগুলিকে খুঁজে বের করে একত্র করার চেষ্টা করেছেন (কাল্লা ও সিং ১৯৮৭)। বইটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনগোষ্ঠীর গঠনবিন্যাস, নারীদের সমস্যা, পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলির উন্নয়ন, উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন, পরিবেশ, জাতিভুক্তিকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধ। যদিও বইটিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ ও জাতি গঠনে প্রয়োজনীয় ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের পথিকৃৎ গবেষণাগুলি সম্পর্কে কোনো প্রবন্ধই আমরা দেখতে পাই না।

দেশ গঠনে নৃতত্ত্ব তথা নৃতাত্ত্বিকদের ভূমিকা কী ছিল? এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পথিকৃৎ নৃতাত্ত্বিক তারকচন্দ্র দাশের লেখা থেকে। গান্ধীজির ৪২-এর আন্দোলনের ঠিক এক বছর আগে তারকচন্দ্র দাশ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় নৃতত্ত্ব বিভাগের সভাপতির ভাষণ দেন। ওই ভাষণটির শিরোনাম ছিল 'জাতি ও ব্যক্তির সেবায় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব'। এই বক্তৃতায় তারক দাশ দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্বের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা নানা উদাহরণ ও নিজের নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বর্ণনা করেন। এর ঠিক দশ বছর বাদে ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য নৃতাত্ত্বিক শশাঙ্কশেখর সরকার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতির ভাষণে শারীরিক নৃবিজ্ঞান কীভাবে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে কাজে লাগতে পারে তা বিশদে আলোচনা করেন। সরকার তাঁর ভাষণে জাতীয় উন্নয়নে বক্তৃতার তারকচন্দ্র দাসের ১৯৪১-এর বক্তৃতার কথাও উল্লেখ করেন।

দেশ গঠনে নৃতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে দাশ ও সরকার গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছিলেন। দাশ তুলে ধরেছিলেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ভূমিকার কথা এবং সরকার শারীরিক নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন নানা উদাহরণ সহযোগে। দাশ ও সরকারের আলোচনা ছিল দিকনির্দেশকারী এবং সাধারণীকৃত (Generalised)। এরকম একটা পটভূমিকায় এরপর দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন এবং উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ সম্পর্কে তদানীন্তন নৃতাত্ত্বিকরা ঠিক কী ধরনের গবেষণা শুরু করেছিলেন সেই আলোচনায় প্রবেশ করব। তবে এ ব্যাপারে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে দেশ গঠনের পথে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়েই স্বাধীন ভারতের নীতিপ্রণেতারা নৃতাত্ত্বিকদের সংগৃহীত তথ্য, পরামর্শ ও উপদেশাবলীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অবশ্যই উক্ত সমস্যাবলীর দেশব্যাপী বিস্তার ও আয়তনের তুলনায় নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণাগুলি ছিল নেহাতই ক্ষুদ্র কয়েকটি হস্তক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, দেশভাগজনিত উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন ও উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ সম্পর্কে তদানীন্তন নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলির গভীরতা, গুণগতমান ও উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে দেশগঠনের পথে খুব একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অথচ ভারতে নৃতত্ত্বের ইতিহাস রচয়িতারা এবং অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সকলেই দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্বের অবদানের বিষয়টি প্রায় এড়িয়ে গেছেন। উক্ত তিনটি সমস্যাবিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের তথ্যভিত্তিক গবেষণালব্ধ পরামর্শগুলিকে তদানীন্তন নীতিপ্রণেতারা কতটা গ্রহণ করেছিলেন সেটা আমার এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নয়। সে প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করব।

দেশ গঠনের পথে উচ্ছেদ সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা

দুর্ভিক্ষ, দেশভাগও উন্নয়নজনিত উদ্‌বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি নিঃসন্দেহে দেশ গঠনের পথে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনালোচিত। উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী সময়ে যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচটি পথিকৃৎ ও প্রয়োগধর্মী গবেষণা নিয়ে আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করব। এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলির সময়কাল অনুযায়ী নীচে উল্লেখ করছি। যেহেতু গবেষণাকর্মগুলি ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সে কারণে আমি সেগুলি ইংরেজিতেই লিপিবদ্ধ করলাম।

১. Bengal Famine (1943) : As Revealed in a Survey of the Destitutes of Calcutta (1949) by Tarak Chandra Das. The University of Calcutta.
২. Resettlement of East Pakistan Refugees in Andaman Islands : Report on Survey of Further Possibilities of Resettlement (1955) by Surajit Chandra Sinha. Govt. of West Bengal.
৩. Studies in Social Tersions Among the Refugees from Eastern Pakistan 1959) by Biraja Sankar Guha. Department of Anthropology. Govt. of India.
৪. Social Processes in the Industrialization of Rourkela (with Reference to Displacement and Rehabilitation of Tribal and other Backward People) (1961) by Bikram Kesari Roy Burman. Office of the Registrar General, India.
৫. A Survey of the People Displaced Through the Koyna Dam (1969, Irawati Karve and Jai Nimbkar. Deccan College. Poona.

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরিউক্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারক চন্দ্র দাশের বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ বিষয়ক গ্রন্থটি ছাড়া বাকি চারটি গবেষণাকর্মই সংগঠিত হয়েছিল ১৯৫১-১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে; অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের প্রথম চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে। এবার আমি ওই গবেষণাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব।

প্রথমত, একমাত্র তারক চন্দ্র দাশের গবেষণাটি ছাড়া বাকি সবকটি গবেষণাই কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের উদ্যোগ ও অর্থানুকুল্যে পরিচালিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে দেশভাগ ও উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ বিষয়ে তদানীন্তন সরকার নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকে যে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য। দাশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, উক্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি বিশেষ কোনো একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন নিয়োজিত ছিল না, যেমনটি উপনিবেশিক সময়ে এবং আরো পরে নৃতাত্ত্বিকরা করে এসেছিলেন। বরং এই গবেষণাগুলি দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ও উন্নয়নজনিত উচ্ছেদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সবরকমের জনগোষ্ঠীগুলির সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানে নিয়োজিত হয়েছিল।

উক্ত গবেষণাগুলি তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তৃণমূল স্তরে সত্যিই যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলির একটা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ তৈরি করা। অর্থাৎ গবেষণাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যাবলী সংগ্রহ ও তার সুসংহত এবং বাস্তবধর্মী বর্ণনা নির্মাণ।

চতুর্থত, গবেষণাগুলিতে নৃতাত্ত্বিকরা কোনরকম তত্ত্বের অবতারণা করেননি এবং অযথা কোনো পশ্চিমী তত্ত্বের সাহায্যও নেননি। ওদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহ যা কিনা দেশের কাজে লাগবে; তত্ত্বের অট্টালিকা নির্মাণের মতো বিলাসিতা করার সময় বোধহয় ওদের হাতে ছিল না।

পঞ্চম যে বৈশিষ্ট্যটি এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলির মধ্যে দেখা যায় তা হল নৃতত্ত্বের প্রধান যে সমস্ত পদ্ধতিগুলি আছে যেমন অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ, বংশলতিকা নির্মাণ ও বিশেষ কোনো সামাজিক ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ সেগুলিকেই মৌলিকভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওই গবেষণাগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় যে উক্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য কখনোই বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশ ও জাতি গঠনের কাজে নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষালব্ধ তথ্যকে কাজে লাগানোই ছিল এই গবেষণাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এবার আমি ক্রমান্বয়ে পূর্বে উল্লিখিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমি শুরু করব তারক চন্দ্র দাশের মহাদুর্ভিক্ষ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থটি থেকে।

বাংলা মহাদুর্ভিক্ষ ও তার প্রতিকারের সন্ধান

তারক চন্দ্র দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের প্রথম নৃতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। উনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৩ সালে। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করার সুবাদে দাশ অনেকগুলি নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা করেন এবং বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন।

এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের পুরুষ জাতি সম্পর্কে ওর লেখা গ্রন্থটি দেশ-বিদেশের নৃতাত্ত্বিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কিন্তু বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ নিয়ে তারক দাশের গ্রন্থটি

ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক মহলে আজও বহু পঠিত ও আলোচিত নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্বে ১৯৪৩-৪৪ সালে বঙ্গদেশে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয় তা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও দেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। দেশ গঠনের সময়ে এই দুর্ভিক্ষ ও তার প্রভাব নিঃসন্দেহে দেশের নীতি প্রণেতাদের কাছে অন্যতম সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছিল। এইরকম একটি বৃহৎ ও ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে তদানীন্তন নৃতাত্ত্বিকরা গবেষণা করার কথা ভেবে উঠতে পারেননি। নৃতাত্ত্বিকরা তখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়েই গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। দুর্ভিক্ষের মতো ব্যাপক ও জটিল সমস্যা নিয়ে সমীক্ষা করার মতো সাহস সে সময় খুব কম নৃতাত্ত্বিকই দেখাতে পেরেছিলেন। তারক দাশ আর কয়েকজন সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে এরকম একটি কাজে ব্রতী হন। দেশের প্রয়োজনে সেই সময় এই নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ছিল অতীব জরুরি। দাশ এই প্রায় অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করে তুলেছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে ওর লেখা *Bengal Famine* গ্রন্থটি তাই দেশ গঠনের কাজে একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী সমাজ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হিসেবেই পরিগণিত হওয়া উচিত, যদি তা হয়নি।

বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা দাশের বইটির অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত অংশটি সম্পর্কে আলোচনা করব। বইটির শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম: 'কিভাবে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'। এই অধ্যায়টির দুটি অংশে দাশ (ক) দীর্ঘমেয়াদী ও (খ) আশু ব্যবস্থাপনাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আশু ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে দাশ প্রথমেই বলেছেন যে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্রুত সমীক্ষা চালিয়ে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন জীবিকার উপর নির্ভরশীল মানুষদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। কারণ দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রেণির মানুষের দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান একইরকম ছিল না, ফলে ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি কিংবা কুটির শিল্পে নিযুক্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন একইরকমভাবে করা যাবে না। প্রত্যেকটি শ্রেণি ও জীবিকা অনুযায়ী পুণর্বাসন পরিকল্পনা করতে হবে। এরপর আসে পুনর্বাসনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে দাশ বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি কারণের মধ্যে যে কারণটি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন কৃষিব্যবস্থার সবচেয়ে বিপজ্জনক যে দিকটি সম্পর্কে দাশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা হল ছড়িয়ে থাকা কৃষিক্ষেত্রগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তন। দাশের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বঙ্গদেশের প্রায় তিন লক্ষ কৃষক পরিবারের কৃষিজমির পরিমাণ তাদের সারা বছরের খাদ্যের যোগানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। উপরন্তু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উক্ত ভূমিখণ্ডগুলির উপর নির্ভরশীল কৃষক পরিবারগুলি সবসময়েই শুধুমাত্র খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা ও ক্ষুধার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হওয়ার মাঝামাঝি একটা বিপজ্জনক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করে। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে কিংবা অন্য যেকোনো কারণে কোনো বছর ফসল উৎপাদনের ঘাটতি হলে এই বিপুল সংখ্যক কৃষক পরিবার অনাহারের সম্মুখীন হতে পারে। এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় একটিই। দাশের মতে ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রগুলিকে একত্রিত করে সমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত আর এরই সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে কৃষিপণ্য থেকে থেকে তৈরি হবে এরকম সব শিল্প ও কলকারখানা। এগুলির বিপননের ব্যবস্থাও করবে কতগুলি সমবায়। এই সমবায়গুলির সভ্য হবে কৃষির উপর নির্ভরশীল নানা ধরনের গ্রামীণ পরিবার। সমবায়ের লাভের অংশ যে যার প্রদত্ত জমি কিংবা শ্রমদান অনুযায়ী পাবে। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে যে দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যায়, অগুনতি মানুষ হয় গৃহহীন সেরকম একটা ভয়ংকর দুর্যোগের উপর তারক চন্দ্র দাশ ও তাঁর ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা শুধু নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাই করেননি, খুঁজে ছিলেন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী সমাজ পুনর্গঠনের সমাধান সূত্র। দেশ ও জাতি গঠনে নৃতত্ত্বের ভূমিকা সমন্ধে প্রায় নিশ্চুপ দিকপাল নৃবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের তুলনায় তারক চন্দ্র দাশ ও বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের উপর তাঁর গভীর অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন

বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের পর যে সমস্যাটি স্বাধীন ভারতের নীতি প্রণেতাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছিল সেটি হল দেশভাগের ফলশ্রুতি হিসেবে লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন। এই উদ্‌বাস্তু সমস্যা ভারতের দুটি রাজ্যকে সবচেয়ে বেশি বিপাকে ফেলেছিল। রাজ্য দুটি হল পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা সংখ্যার দিক থেকে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব পাঞ্জাবের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা লক্ষাধিক উদ্‌বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বাইরে উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে বাইরে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য ও সুদূর ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেশ কিছু

বাঙালি উদ্‌বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। যাইহোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বেশ কিছু উদ্‌বাস্তু পরিবারকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের জন্য নিয়ে যান। উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। এই পুনর্বাসনের কাজ কতটা সফল হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ কী সে সম্পর্কে খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের সদ্য স্নাতকোত্তর এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রকে ১৯৫১ সালে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই ছাত্রটি ছিলেন সুরজিৎ সিংহ। পরবর্তীকালে সুরজিৎ সিংহ ভারতীয় নৃতত্ত্বের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে জগৎ-বিখ্যাত হন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সুরজিৎ সিংহের কাজ ছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলি সম্পূর্ণ অজানা একটি পরিবেশে ঠিক কী ধরনের জীবনযাপন করছেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কীভাবে গড়ে উঠেছে, ওদের বাস্তব সমস্যাগুলিই বা কীরকম এবং সর্বোপরি আরো উদ্‌বাস্তু পরিবারকে ওই দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসিত করার সম্ভাবনা আছে কিনা এ সমস্ত বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযতভাবে অবহিত করা। সুরজিৎবাবু প্রায় তিন মাস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় গভীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রচুর তথ্য প্রমাণ সহযোগে দেশ গঠনের এই দুরুহ কর্মযজ্ঞে সামিল হন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেন। সুরজিৎবাবুর গবেষণা সম্বলিত রিপোর্টটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ করেন ১৯৫৫ সালে। যদিও পরবর্তীকালে এই মহামূল্যবান রিপোর্টটি নিয়ে খুব একটা আলোচনা ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী মহলে হয়নি। দেখ যাক সুরজিৎ সিংহ তাঁর রিপোর্টে উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন ও এবিষয়ে নৃতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে কী বলেছিলেন:

> সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একজন ছাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন। যেকোনো সামাজিক অবস্থাকেই নৃতত্ত্বের ছাত্র এমনভাবে যাচাই করেন যার সাহায্যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষগুলির সমস্তরকম চাহিদা মেটাতে উক্ত সামাজিক অবস্থা সক্ষম কিনা তা বোঝা যায়। নৃতাত্ত্বিকের পর্যবেক্ষণে শুধুই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয় সামাজিক সম্পর্ক ও নানারকমের সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতএব উদ্‌বাস্তুদের সঙ্গে মূলনিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও বিচ্ছিন্ন নয়। (সিংহ ১৯৫৫)

নিজের নৃতাত্ত্বিক অবস্থানটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার পর সুরজিৎ সিংহ উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে তাঁর প্রয়োগধর্মী গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করেন। ওর গবেষণার উদ্দেশগুলি ছিল এরকম: ১. আন্দামানে পুনর্বাসিত বাঙালি উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির উপর নিবিড় আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, ২. উদ্‌বাস্তু ও পূর্ববর্তী সময়ে আগত জনগোষ্ঠীগুলির আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে একটা তুলনামূলক বিচার, ৩. উদ্‌বাস্তু ও পূর্ববর্তী সময়ে আগত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর্থ-সামাজিক লেন-দেনের উপর সমীক্ষা ও ৪. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভবিষ্যতে আরো উদ্‌বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থানগুলির চিহ্নিতকরণ। সুরজিৎ সিংহ যে কতটা গভীরভাবে আন্দামানে বাঙালি উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন তা তাঁর দুষ্প্রাপ্য রিপোর্টটি পড়লে বোঝা যায়। উক্ত রিপোর্টে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পটভূমিকায় বাঙালি উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা সত্যিই দুর্লভ। তবে সুরজিৎবাবু শুধুমাত্র প্রশ্নতালিকার মাধ্যমে প্রাপ্ত কতগুলি পরিমাণগত তথ্যের বর্ণনা করেননি, উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির সঙ্গে নেহাৎই আড্ডার মাধ্যমে যেসব তথ্য উনি সংগ্রহ করেন সেগুলিও রিপোর্টে সংযোজিত হয়েছিল। এককথায় আন্দামানে উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত এই মহামূল্যবান প্রায় হারিয়ে যাওয়া নৃতাত্ত্বিক রিপোর্টটি আসলে একটি সামাজিক দলিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকার দ্বারা নিযুক্ত নৃতাত্ত্বিক হিসেবে সুরজিৎ সিংহ কিন্তু পুনর্বাসনে সরকারি ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেননি। রিপোর্টের ১৪ পৃষ্ঠায় একটি সারণির সাহায্যে সিংহ বলেন:

এই তালিকাটি থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলিকে যে পরিমাণ জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দেওয়া হয়নি। উপরন্তু পুনর্বাসিত পরিবারগুলির মধ্যে জমি বিতরণে গরমিলের পরিমাণ প্রভূত। এর ফলে উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে একাত্মবোধ করছে না। উদ্‌বাস্তুরা এখনও এই আশায় আছেন যে সরকার তাদের প্রতিশ্রুত পরিমাণ জমি অন্য কোনো জায়গায় বিতরণ করবেন। উদ্‌বাস্তুদের অভিযোগ যে বিতরণের সময় জমি খণ্ডগুলিকে সন্তোষজনক পদ্ধতি অনুযায়ী মাপজোক করা হয়নি" (সিংহ ১৯৫৫, পৃ. ১৪)।

উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতার পাশাপাশি সুরজিৎ সিংহ নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্‌বাস্তু

জনগোষ্ঠীগুলির সীমাবদ্ধতার দিকটিও তুলে ধরেন। পুনর্বাসিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পরেও উদ্‌বাস্তুরা সরকারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে অভিযোগ ও আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির জন্য তাদের শক্তিক্ষয় করে চলেছিল। যদিও কৃষিজীবী পরিবারগুলি সমতল জমিতে ভালোই চাষবাস করছিলেন কিন্তু জঙ্গল হাসিল করে নতুন কৃষিজমি আবাদ করার ব্যাপারে ওদের উৎসাহ বেশ কমই ছিল। তাছাড়া জঙ্গল সম্পদ আহরণ ও সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে খুব একটা উদ্যম লক্ষ্য করা যায়নি। সুরজিৎবাবু অবশ্য শুধুই একরাশ হতাশাব্যঞ্জক তথ্য হাজির করেননি। ওঁর বর্ণনাতে এটাও পাওয়া যায় যে উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মানুষরাও আন্দামানে হাতে লাঙল তুলে নিয়েছিলেন; এমনকী তাদের অনেককেই জঙ্গল হাসিল করে চাষবাস করতেও দেখা গেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সুরজিৎ সিংহের নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র বাঙালি উদ্‌বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একই সঙ্গে উনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে জনগোষ্ঠীগুলি বাঙালি পরিবারগুলির থেকে অনেক আগেই আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল তাদের উপরেও সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। উক্ত গোষ্ঠীগুলি আন্দামানে কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ চালিয়ে সফল হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বাঙালি উদ্‌বাস্তুদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহাবস্থান করেছিল তার জটিল ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় সুরজিৎবাবুর অনবদ্য বর্ণনায়। তদানীন্তন স্বাধীন সরকারের প্রতি সুরজিৎ সিংহের সুপারিশগুলির মূল কথা ছিল তিনটি: ১. উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা মেনে করতে হবে, ২. এই পরিকল্পনা হবে স্বচ্ছ এবং ৩. অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ উদ্‌বাস্তুদের বাদ দিয়ে উপর থেকে এই পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। উদ্‌বাস্তুদের সঙ্গে নিয়েই সরকারকে ভবিষ্যতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। দেশ গঠনের পথে উদ্‌বাস্তু সমস্যার সমাধানে সুরজিৎ সিংহের অবদান নৃতাত্ত্বিক মহলে আজও প্রায় অজানা এবং অপরিচিত একটি অধ্যায়। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এই মহামূল্যবান নৃতাত্ত্বিক গবেষণাটির পুনঃপাঠ তাই অতীব প্রয়োজনীয়।

ছবি : নন্দলাল বসু

কুড়ি কুড়িতে সুবর্ণজয়ন্তী

শুভময় মৈত্র

দু-হাজার কুড়ি গত শতকের সত্তরে জন্মানো শিশুদের কাছে বেশ গুরুত্বের। কারণ মনে আজও শৈশব রয়ে গেলেও শরীরে থাবা মারছে পঞ্চাশটি বছর। এই সুবর্ণজয়ন্তীতে মাঝে মাঝে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে কেমন ছিল সেই সময়ের শহরটা? কেমন ছিল সেই দিনের সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা কিশোরদের যৌবনে পদার্পণের দিনগুলো? প্রতিযোগিতার তীক্ষ্ণতা ছিল না বললে ভুল হবে, তবে তা আজকের দিনের তুলনায় অনেক মোলায়েম। ছোটোদের খেলার সময় ছিল। সেগুলো মনে রেখেই এই লেখা। পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কখনো-বা সামান্য মন কেমন।

একাদশ— অঙ্ক এবং খোটুর কুকুর

মাস্টারমশাই বা দিদিমণিদের ওপর ছাত্রছাত্রীদের রাগ চিরন্তন। শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা নেই বললে অবশ্যই মিথ্যাভাষণ হবে, তবে সে গল্প অন্যদিন। মন ছুঁয়ে যাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা আর পড়ুয়াদের আন্তরিক আদানপ্রদানের কাব্যিক বর্ণনা আজকের লেখায় অনুপস্থিত। বরং মে দিবসের প্রাক্কালে এই গদ্যে শুধুই শ্রেণিশত্রুতার বিবরণ। আর এই আলোচনার মূলে যে চরিত্র, বন্ধুমহলে তার নাম খোটু। না না, মোটেও সে অবাঙালি কেউ নয়, বরং আমার আপনার ভীষণ পরিচিত অয়ন চক্রবর্তী। ভালো ছেলে অয়ন থেকে ঠিক কোন বিবর্তনের ফলে খোটুতে পৌঁছোনো যায়, জীববিজ্ঞানের গবেষকরা সেটা ভাবুন, সেই ফাঁকে আমরা সময়ঘড়িতে উলটো ডিগবাজি খেয়ে অবতরণ করি কেষ্টপুর খালের ধারে। কেষ্টপুর খালের জল বেশ কয়েক দশক ধরেই পচা। সম্ভবত স্বাধীনতার আগে থেকেই। উল্টোডাঙা থেকে পূর্বদিকে বিমানবন্দরের দিকে এগোলে আপনার বামপন্থী চেতনায় একে একে আবির্ভূত হবে দক্ষিণদাঁড়ি, পাতিপুকুর, শ্রীভূমি, লেকটাউন, বাঙুর, দমদম পার্ক আর অন্যদিকে একটানা দক্ষিণপন্থী লম্বা লবণহ্রদ। অগ্রগতির ঝাঁ চকচকে ভিআইপি রোডের ডানদিকে লবণহ্রদে পৌঁছোতে গেলে জনগণকে কেষ্টপুর খাল পেরোতেই হবে। পচা হলেও এই কেষ্টপুর খাল দিয়ে আশির দশকে নিয়মিত খড় বোঝাই নৌকা চলত তিরতির করে। বাম আমলের শেষের দিকে একবার কেষ্টপুর খালে বিপুল সংস্কার করে লঞ্চ চালানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীবোঝাই জলযান মাঝখানে আটকে গিয়ে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। এর মধ্যে নাকি দুষ্টু ছেলেরা কাদাজলে ঢিল ছোঁড়ায় এক বরিষ্ঠ মন্ত্রীর ধুতিতে কাদা লেগে গেছিল। সেই ইতিহাস মনে রেখে বাম পরবর্তী জমানায় তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের বাৎসরিক বাজেটে খাল সংস্কারের জন্যে বছরে এক টাকার বেশি বরাদ্দ করছেন না। এখন শুধু রামরাজ্যে কেষ্টপুর খালের টেমস কিংবা শ্যেন হওয়াটাই বাকি।

এই কেষ্টপুর খালের ধারে নিজের পোষা ছোটুকে নিয়ে সকাল-বিকেল ঘুরতে যেত লবণহ্রদের খোটু। ঘুরতে যেতেই হত, কারণ তার আবদারে বাবা যখন অতিষ্ঠ হয়ে এই অ্যালসেশিয়ান কিনে দিয়েছিলেন, তখন রীতিমতো চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে সকালে ছোটুর প্রাতঃকৃত্য এবং তার সান্ধ্যকালীন ব্যাপার-স্যাপারের দায়িত্ব অয়নকেই নিতে হবে। বাড়ি-ঘর কোনোমতেই নোংরা করতে দেওয়া যাবে না। সময়ের নিয়মে বড়ো হল ছোটু, সঙ্গে বাড়ির আদরের অয়নও অনেকটা লম্বা চওড়া হয়ে গেল। বোধহয় খুব কুচি কুচি করে মাথায় কদমছাঁট দেওয়ার জন্যে স্কুলে সে জনপ্রিয় হল খোটু নামে। আশির দশকে লবণহ্রদ বেশ ফাঁকা ছিল। স্কুল থেকে ফিরে হাতমুখ ধোয়া। তার কিছুটা পরে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হতে হতে ছোটুকে নিয়ে খোটু কেষ্টপুর খালের ধারে। তখন সল্টলেকে গাড়ি খুব বেশি চলত না। আজকের মতো রাস্তার ধারগুলো সার সার গাড়ি রাখার জায়গা হয়ে যায়নি। তবু তার মধ্যেই দু-একটা থেমে-থাকা গাড়ি খুঁজে পেলেই সেগুলোর চাকায় ছোটো বাথরুম সারত ছোটু। এরপর খালের আরো কাছাকাছি পৌঁছে ঝোপঝাড়ে ভরা এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় বড়ো বাথরুম।

স্কুলের কাছেই অয়নের বাড়ি। সে যখন স্কুল থেকে ফিরে ছোটুকে নিয়ে বেরোয়, সেই সময় বাকি কাজ সেরে ফুটব্রিজের

দিকে ফেরেন অঙ্কের স্বপন মাস্টার। কোনো কারণে অঙ্কের সঙ্গে খোটুর খুব বনিবনা ছিল না, আর তার ছাপ পড়েছিল স্বপন মাস্টারের সঙ্গে তার সম্পর্কেও। ছোটুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় মাঝে মাঝেই স্বপনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আর বিচ্ছিরি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে মাস্টারমশাই সুযোগ পেলেই শোনাতেন, 'ঠিক কাজটাই করছিস। এখন কুকুর চরিয়ে অভ্যেস কর, পরে সুযোগ মতো গরু-ছাগল চরিয়ে রোজগার করতে পারবি।' এটুকু অপমান রোজকার সকালের কালমেঘ খাওয়ার মতো সহ্য করে নিয়েছিল খোটু। কিন্তু সেদিনের অঘটন অনেক বড়োমাপের। ঝোপের ধারে ছোটু যখন কাজ সারছিল, সেই সময় দূর থেকে রাস্তার কিছু নেড়ি তার উদ্দেশে ঘেউ ঘেউ করে কিছু অপমানজনক কথা বলে থাকবে। মালিক খোটু মাস্টারের অপমান সহ্য করতে পারে, কিন্তু কুকুর ছোটু জাতে অ্যালসেশিয়ান। তাই সেও হুংকার দিতে শুরু করে। সাধারণত এরকম ঘটলেও কিছুক্ষণ পরে ছোটু শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন অশান্ত অ্যালসেশিয়ান লোহার চেনের বাঁধন ছাড়িয়ে তাড়া করে যায় নেড়িদের দিকে। আর টাল সামলাতে না পেরে খোটু উলটোদিকে ছিটকে পড়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে। পাশে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন অঙ্ক মাস্টার স্বপনবাবু। হাত পা ছিড়ে যাওয়া খোটুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে চলতে থাকে এরপরেও বেশ কিছুদিন। স্বপনবাবুর রসালো গল্পে সারা ক্লাসের সামনে বেইজ্জত এগারো ক্লাসের ছাত্র।

প্রতিহিংসা বাড়তে থাকে খোটুর মনে। লবণহ্রদ বা বিধাননগরে তো আর একটা স্কুল নয়, আরো কয়েকটা আছে। অন্য স্কুলের দুই দশাসই বন্ধুকে প্রচুর ঘুষ খাইয়ে ম্যানেজ করল খোটু। তারা স্কুল থেকে ফিরে ওত পেতে থাকবে কেষ্টপুর খালের ধারে। স্বপনবাবু যখন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরবেন, সেই সময় তাঁকে চেপে ধরে চ্যাংদোলা করে তারা ফেলে দেবে ঝোপের মধ্যে। এই সময়টা রাস্তায় লোকজন বেশি থাকে না। ফলে তারপর সাইকেল চেপে পালাতে বেশি দেরি হবে না তাদের। সেদিন ছোটুকে চরাতে অনেকটা পরে বেরোবে খোটু যাতে কোনোভাবেই মাস্টারমশাই তাকে সন্দেহ না করতে পারেন। তার কীর্তিমান বন্ধুদের সে স্বপন মাস্টারের বর্ণনা আগেই দিয়ে রেখেছিল। তাঁর কাঁধের রংচটা চটের ব্যাগটাই অবশ্য চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। কথা হয়েছিল যে মাস্টারমশাইকে ঝোপে ফেলার পরে খোটুদের বাড়ির পাশের গলি দিয়েই সাইকেল নিয়ে পালাবে দুই বন্ধু, আর ঠিক তিনবার করে ঘন্টি বাজিয়ে। পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি হয়নি। সবকিছুই ঘটেছিল অঙ্ক মিলিয়ে। দুটো সাইকেলের তিনবার করে ঘণ্টার শব্দ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অয়ন। কিছুক্ষণ পর মা এসে তাড়া দিলেন, 'কী রে? ছোটুকে নিয়ে কখন বেরোবি? সন্ধে যে হয়ে গেল।' আরো কিছুটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে গলিপথে নামল খোটু। সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে। আবছা আলো আঁধারি। কেষ্টপুর খালের পাশে আশির দশকে লবণহ্রদের দিকটায় বেশ অন্ধকার। ভিআইপি রোডের ঝকমকে আলো তখন ছিল না, তাই আজকের মতো খাল পার হয়ে চুঁইয়ে আসত না উলটোদিকে। দেরি হয়ে যাওয়ায় ছোটুও বেশ ছটফট করছিল। তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছিল অয়ন। 'কী রে? আজকে দেরি কেন? ', শুনেই বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল খোটুর। পেছনে হেঁটে আসছেন স্বপনবাবু। 'আজকে স্কুলের কাজ সেরে বেরোতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল রে।' হনহন করে সামনের অন্ধকার রাস্তায় হারিয়ে গেলেন স্বপনবাবু।

দ্বাদশ— উচ্চ মাধ্যমিক

কেমিস্ট্রির বাংলা যে কীভাবে রসায়ন হল সে একমাত্র ভগবানই জানেন। ফিজিক্সের বাংলা নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই। পদার্থবিদ্যা যে আমাদের মতো অপদার্থরা কোনোভাবেই বুঝবে না সেটা চিরন্তন সত্য। দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়লেই অনুধাবন করবেন যে যার বুদ্ধি আর শক্তি বেশি, তার কথাই সত্যি। আকাট মূর্খ, দুর্বল, অভাগা মানুষ কখনো সত্যি বলতে পারে না। ফিজিক্স সকাল-বিকেল অ্যাটম বোম বানাতে পারে। ফলে তার যুক্তি অকাট্য। আমাদের সময় এইসব রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার একক আবির্ভাব হত মাধ্যমিকের পর। তার আগে অবধি এরা মিলেমিশে একাকার। ইংরেজিতে ফিজিক্যাল সায়েন্স, আর বাংলায় ভৌতবিজ্ঞান। আমার মতো ভুতোদের কাছে ভূতবিজ্ঞানের মতোই। তার প্রথমে থাকত পদার্থবিদ্যা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে নিউটনের প্রথম সূত্রের কথা মনে পড়ে যেত। বোঝার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই ঝেড়ে মুখস্ত। 'বাহির হইতে প্রযুক্ত বলের দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে আর চলমান বস্তু চিরকাল একই বেগে চলিতে থাকিবে'। আমার তো প্রথমটাই পছন্দ। ঘুম থেকে উঠে যদি বাইরে থেকে কোনো খ্যাঁচখ্যাচানি না থাকে তা হলে আর ওঠে কে? তার ওপর শীতকাল হলে তো কথাই নেই। লেপের তলায় মাথা ঢেকে কেমিস্ট্রির অক্সিজেনের অভাবে আমি তো কোমায়। একমাত্র লেপটাকে গা থেকে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে গায়ে ঠান্ডা জল ছেটানোর আগে পর্যন্ত নিউটনের প্রথম সূত্রের রমরমা। তবে ততক্ষণে বল প্রয়োগ হয়ে গেছে। ফলে এবার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আসবে। সেখান থেকে ভরবেগ বা মোমেন্টাম। তখন বয়েস অল্প, পেটের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে কোনো অসুবিধে ছিল না। আজকের কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা আধবুড়ো তখন আশির দশকের নবীন কিশোর। ফলে পেটে সকালের গরম চা আর চাটুতে

সেঁকা কড়কড়ে রুটি বিস্কুট বিক্রিয়া শুরু করলেই ভরবেগের বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু মুশকিল কম নয়। তখন তো আজকের মতো দু-ঘরের ছোটো ফ্ল্যাটে দু-খানা বাথরুম ছিল না। বরং ভাড়াবাড়িতে পাশাপাশি তিনটে পরিবারের জন্যে একটা সুলভ শৌচালয়। সেখানে মাঝে মাঝেই লম্বা লাইন। কেউ একটু দেরি করলেই তাকে বাইরে থেকে চিৎকার করে নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে করিয়ে দেওয়া হত। 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।' আজকে যদি তুই বেরোতে দেরি করিস আর কালকে আমি যদি আগে ঢুকি তখন কিন্তু আজকের আমি আর আগামীর তুই এক হয়ে যাবি।

তো জীবনযুদ্ধের এইসব সূত্র শিখতে শিখতে মাধ্যমিকের গণ্ডি কোনোমতে পার করা গেল। এবার এল উচ্চমাধ্যমিক। রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা আলাদা হল, একান্নবর্তী পরিবার ত্যাগ করে তারা নিজেরাই এক একটা গোদা বই। গোলমালের শুরু এখান থেকেই। রসায়নের রস কেউই খুব একটা পাচ্ছিল না। বরং আচম্বিতে তাড়া করছিল এদিক ওদিক থেকে পথহারা আয়নদের সান্ধ্যকালীন পথনাটিকা। না বুঝে একদিন প্রতিদিনের পাঠ মুখস্ত চলছিল যথারীতি। সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের কোথাও ঢালু সমতল, কোথাও বা এবড়োখেবড়ো ঘর্ষণ। শেষের দিকে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থও ঢুকে পড়েছিল। মাঝে মাঝেই হতাশ হয়ে ভাবতাম পারমাণবিক বোমা যুদ্ধবাজ দেশগুলোর হাতে আর দু-একটা বাকি আছে কিনা। তা হলে লেখক, প্রকাশক আর সিলেবাস রচয়িতাদের চিরকালের মতো ঝলসে দেওয়া যেত। মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকের মানের পার্থক্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হচ্ছিল। দেখতে দেখতে এসে গেল উচ্চমাধ্যমিক। আশির দশকের সঙ্গে আজকের একটি মিল কিন্তু রয়ে গেছে। সরকারি বা বোর্ডের পরীক্ষাগুলো সেই সময় যখন হত এখনও সেটা খুব বদলায়নি। বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের আগমনে এখনও রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া আর তাদের বাবা-মায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমাদের মতোই প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমাদের দুই বন্ধু নিমু আর উদু, অর্থাৎ নির্মল সেন আর উদয় চৌধুরী। ক্লাসে তাদের রোল নম্বর পর পর, উচ্চমাধ্যমিকেও সামনে পেছনে বসা যাবে। কড়া পরীক্ষক থাকলেও দু-একটা উত্তর মিলিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়। খুব বিপদে পড়লে অল্প একটু ফিসফাসও চলতে পারে। প্রথম দুটো পরীক্ষা বাংলা আর ইংরেজি। তাতে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েনি। বরং মুখস্ত করে আসা রচনা প্রশ্নপত্রে হাসি হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তবে এরপরেই বিজ্ঞান, যত ঝামেলার শুরু। যাই হোক কোনোমতে অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিদ্যার হার্ডলস টপকানো গেছে। এবার শেষ পরীক্ষা। আর তারপর মুক্তি। রসায়ন দিয়ে যন্ত্রণার উপসংহার।

নিমু আর উদুর পরীক্ষাও ভালো হচ্ছিল। অন্যদের মতো সুযোগ পেলে ফিসফাস, দরকারে হাতের ইশারা কিংবা কোনো একটা উত্তর বন্ধুকে দেখানোর তাগিদে অদ্ভুতভাবে বেঁকে বসে লেখা, এসব ঠিকঠাকই চলছিল। প্রথম দিন উত্তেজনার বশে পরীক্ষা দিতে ঢোকার আগে জল খাওয়া হয়নি উদুর। ফলে কিছুক্ষণ পরেই গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু অন্য স্কুলের দুঁদে অচেনা মাস্টার প্রথম ঘণ্টা বাজার আগে নড়তে দেননি। তাই ঘণ্টা পড়ার পর দরজার বাইরে অনেকটা জল খেয়ে, তারপর ছোটো বাথরুম ঘুরে এসে আবার লেখা শুরু করেছিল উদু। প্রথমদিন পরীক্ষা ভালো হয়েছিল। আর তাই প্রতিদিন পরীক্ষার সময় এটাই ছিল তার দৈনন্দিন তুক। শেষ পরীক্ষার দিনও সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল তার। তবে সামনে বসে থাকা নিমুর রসায়ন খাতায় রসস্থ কালিভরা কলমের দাগ বিশেষ নড়াচড়া করছিল না। ফিসফিস করে নিমুকে সাহস দিয়েছিল উদু, 'যা পারছিস লেখ। আমি সুযোগমতো দু-একটা উত্তর তোকে বলে দেব। আর এরপর সেকেন্ড পেপার তো আছেই। সেখানে কিছুটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। সবশেষে স্কুলের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার নম্বর মিলিয়ে ঠিক পাশ করে যাবি। আপাতত যা হোক কিছু হিজিবিজি করে যা।' এর মধ্যে প্রথম ঘণ্টার ঢং। উদুর তুক শুরু হয়ে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল 'জল খাব স্যার আর বাথরুমেও যাব।' 'একসঙ্গে দুটো?' বিরক্ত মাস্টার। কিন্তু নিয়ম মেনে অনুমতি দিলেন। বাইরে গিয়ে মেপে এক গেলাস জল খেল উদু। তারপর বাথরুমের দিকে। মিনিট পাঁচেক পর নিজের জায়গায় ফিরে উদুর চক্ষু চড়কগাছ। সামনের সিটে নিমু নেই। 'ও কি বাথরুমে গেছে স্যার?' উদুর প্রশ্ন। কিন্তু একই ঘর থেকে তো দুজনকে বাইরে ছাড়ার নিয়ম নেই! 'ও কোথায় গেছে তাতে তোমার কী?' মাস্টার আরো বিরক্ত। ততক্ষণে উদু দেখেছে সামনে মাস্টারের বড়ো টেবিলে রাখা একটা খাতা, যার হাতের লেখা তার অতিপরিচিত। বুঝতে দেরি হয়নি যে নির্মল বিশেষ কিছু লিখতে না পেরে হতাশ হয়ে খাতা জমা দিয়ে চলে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে এক ঝটকায় উদু ঘরের বাইরে। লবণহ্রদের ছেলেদের সিট পড়েছিল ফুলবাগানের স্কুলে। দোতলার সিঁড়ি একলাফে টপকে নীচের গেটে। দারোয়ান কিছু বলার আগেই উদুর দৌড়। ফুলবাগান মোড়ের বাস স্টপেজের দিকে। এক মিনিটের মধ্যে রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে থাকা উদু দেখছে উলটোদিকে থেমে থাকা বাসে উঠছে নিমু। কলকাতার যীশু কবিতায় ল্যাংটো বাচ্চাটা যেভাবে সারা শহরকে থামিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে ফুলবাগান মোড়ের ট্রাফিক ছত্রভঙ্গ করে উলটোদিকের বাসের সামনে উদ্‌বাহু উদু। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল অ্যাক্সিলেটর দাবানো

বাস। সামনে ছিটকে পড়ল উদু। তবে চোট সামান্য, হাঁটুটা ছড়েছে। বাসের সামনের গেট দিয়ে উঠে পেছন গেটে দাঁড়িয়ে থাকা নিমুকে এক চড়। 'এক্ষুনি ফিরে চল পরীক্ষা দিতে'। বাস থেকে নিমুকে টেনে নামিয়ে আবার পরীক্ষাকেন্দ্রের দিকে হাঁটা। সেখানে তখন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টার। থানায় খবর দিতে যাবেন কিনা ভাবছেন। সব বোঝাতে দশ মিনিট সময় লেগেছিল উদুর। হেডমাস্টার ভালো মানুষ। বন্ধুত্বের দাম বুঝেছিলেন। উদুর সামনে নিমু। ক্লাসের গার্ডকে সরিয়ে দিয়ে ফুলবাগানের স্কুলের হেডমাস্টার সেদিন নিজেই পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিমু সেকেন্ড হাফের পরীক্ষাও দিয়েছিল। রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল সে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। পরীক্ষাটা না দিলে সে বছরটা নষ্ট হয়ে যেত। এখন খুব বড়ো সাংবাদিক সে। আর উদু মার্কিন দেশের ইঞ্জিনিয়ার। সে দেশের দেশোয়ালি উচ্চারণে উদু থেকে 'উঢো' হয়েছে। রোজ ফেসবুকে নিমুর সঙ্গে আড্ডা না মারলে এখনও ঘুম হয় না তার। আর সারা জীবনের আফশোস বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে নিমু। উদু উচ্চমাধ্যমিকে এক নম্বর কম পাওয়ায় কুড়ির মধ্যে আসতে পারেনি। একই স্কুল থেকে সে বছর উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল প্রসূন, ডাকনাম প্যানা। খবরের কাগজের ইন্টারভিউতে হাসিমুখে বলেছিল, আমাদের আসল ফার্স্ট উদয় চৌধুরী।

উপসংহার— জয়েন্ট এন্ট্রান্স

এই গল্পটা জয়েন্ট নিয়ে। জয়েন্ট মানে ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের অতিপরিচিত পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স। সাধারণভাবে জয়েন্ট নামেই পরিচিত উচ্চ মাধ্যমিকের ঠিক পরেই এই পরীক্ষা। সত্তর দশকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা আজও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার সূর্যতোরণ। এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে সারা দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে একটাই পরীক্ষা হবে। ডাক্তারির ক্ষেত্রেও গত কয়েক বছরে এই নিয়ে অনেক গোলমাল চলেছে। আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা যৌথ তালিকায়। তাই কেন্দ্র এরকম নিয়ম করতে পারে কিনা তাই নিয়ে স্বভাবতই তর্ক বিতর্ক চলেছে, চলছে এবং চলবে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গত প্রায় দুই দশক ধরে আমাদের রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্যে প্রচুর বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। সেগুলোর মান নিয়ে যদিও প্রচুর প্রশ্ন। অনেক জায়গাতেই সঠিক পরিকাঠামো প্রায় নেই এবং তার ফলে এরকম অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় উঠে যাওয়ার মুখে। সেগুলোতে পড়াশোনার হাল বেশ খারাপ। আশির দশকে কিন্তু স্নাতকস্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্যে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না। হাতে গোনা চারটে সরকারি জায়গা ছিল যাদবপুর, শিবপুর, দুর্গাপুর আর শিলিগুড়ি (এর মধ্যে শিবপুর আর দুর্গাপুরে ভরতি এখন আর রাজ্য সরকারের হাতে নেই, তবে যুক্ত হয়েছে কল্যাণী)। আসন সংখ্যা ছিল সর্বাধিক দু-হাজারের মতো। তাই আজকের দিনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আসন ধরে যেরকম কুড়ি তিরিশ হাজার সফল পড়ুয়ার তালিকা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড অন্তর্জালে ভাসিয়ে দেয়, আশির দশকে সেসব ছিল না মোটে। সে সময় মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিকের মতোই ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারির তালিকাও ছাপা কাগজে বেরোত। তবে মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিকে সাইকেল চেপে লোকে যেমন গেজেট নিয়ে ঘুরে বেড়াত, পাঁচ বা দশ টাকার বিনিময়ে তাদের কাছে প্রথম ফল জানা যেত, জয়েন্টের ক্ষেত্রে সেরকম ছিল না। কলকাতার কয়েকটা জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া হত ফলাফল। সেখানে গিয়ে দেখে আসতে হত।

আজকাল ভারতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে ভীষণ হইচই। গাদা গাদা কোচিং সেন্টার। দক্ষিণা সাংঘাতিক বেশি। বাচ্চারা শিশুবিভাগে পড়ার সময় থেকেই বাবা-মা-রা পারলে বারো ক্লাসের বিজ্ঞান পড়া শুরু করিয়ে দিচ্ছেন। আশির দশকে ব্যাপারটা কিছুটা অন্যরকম ছিল। নামকরা মাস্টারদের বাড়িতে গিয়ে পড়তে হত। এই সব পড়ার মাইনে ছিল সাধারণভাবে এক একটা বিষয়ের জন্যে এক-দুশো টাকার মতো। সেটা না দিতে পারলে মাস্টারমশাইরা অবশ্যই কমিয়ে দিতেন, কখনো-বা বিনি পয়সাতেও পড়াতেন। তবে এটা সত্যি যে এই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে সফল হওয়া না হওয়া আশির দশকে মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়ের কাছে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তখন থেকেই পড়াশোনা নিয়ে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বীজ পোঁতা শুরু হচ্ছিল বাংলার মাটিতে। জয়েন্ট পেয়ে বেশ খুশি হওয়া বা না পেয়ে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা আজকের মতো সে দিনগুলোতেও ছিল। আজকের দিনে গুরুজনদের চাপে বাচ্চাদের মধ্যেও ভীষণ প্রতিযোগিতার ভাব। আশির দশকে তা ছিল না বললে মিথ্যে হবে, তবে তার তীব্রতা ছিল অনেকটা কম।

জয়েন্টের ফল বেরোবে। আমরা সবাই কম-বেশি স্নায়ুর চাপে ভুগছি। কেউ-বা নিজে যাবে ফল দেখতে, কারো-বা বাবা অফিস ফেরত দেখে আসবেন। আমাদের বন্ধুদের বিরাট দল। তার মধ্যে আমরা চারজন গলায় গলায় বন্ধু, একসঙ্গে যাব মেডিকেল কলেজে। লেকটাউন জয়া সিনেমার কাছে একজোট হলাম। তার পর এস-ফাইভ বাসে চেপে মেডিকেল কলেজ। ফল তো আগেই কপালে লেখা হয়ে গেছিল। পাশাপাশি অনেক কাগজ টাঙানো। আমাদের দুই বন্ধুর নাম চট করে মিলে গেল সেই তালিকায়। অনেক খেটেও অন্য দুজনের নাম গাদা গাদা

কালো ইংরেজি অক্ষরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর এক অতি অপ্রস্তুত পরিস্থিতি। জীবনের সব থেকে বড়ো অস্বস্তির সময়। একদিকে নিজের সফলতা, আর অন্যদিকে নিজের থেকেও অনেক বেশি আপন ছেলেবেলার বন্ধুর মন কেমন করা মুখ। ফেরার পথে বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অতীন বলল 'আরে তোরা তো পেয়েছিস, সেটাই দারুণ ব্যাপার। পরের বছর দেখবি আমাদের ঠিক হয়ে যাবে। এবার আরো চেপে পড়তে হবে'।

পরের বছর সত্যিই অতীন দারুণ ফল করেছিল। এখন সে কলকাতায় সবথেকে বড়ো সফটওয়্যার কোম্পানিতে বিরাট উঁচু পদে চাকরি করে। কিন্তু বদলায়নি একদমই। নিজের পাওয়া না পাওয়া ভুলে আজও হাত বাড়াতে ভোলে না কেউ বিপদে পড়লে। সুজিত পরের বছরও জয়েন্ট পায়নি। খুব হতাশ হয়েছিল। আশির দশকের শেষের সেই অসফল সুজিত আজ মার্কিন দেশের স্বচ্ছল নাগরিক। খুব নামী এক ওষুধ কোম্পানির মাথায় বসে আছে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। তখন তার চিলেকোঠার ঘরে বসে গল্প করি আমরা সবাই। আশির কিশোরেরা এখনও আশি না হলেও সবাই পঞ্চাশ। আমাদের আড্ডায় মরা-বিকেলের তেরছা রোদ্দুর উঁকি মারে জানলার ফাঁক দিয়ে। জয়েন্ট, এর বাংলা মানে যুক্ত। সময় আর দূরত্বের বোকা বোকা যুক্তি ভুলে আশির দশকের বন্ধুগুলো বেশ কয়েকটা দশক পার করে আজও একইভাবে যুক্ত। এখনও যদি পাতিপুকুরের গলিতে, লেকটাউনের রাস্তায়, বাঙুড়ের মাঠের পাশে বা লবণহ্রদের কোনো পার্কে একগাদা আধবুড়োকে একটা সিগারেট ভাগ করে টানতে দেখেন, বুঝবেন ওরা আজকেও আশির কিশোর। সেদিন কে জয়েন্ট পেয়েছিল আর কে পায়নি, ওদের দেখে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। কারণ সবার জন্মদিন তো একই বছরে।

ছবি : নন্দলাল বসু

আলুচাষি যাবেন কোথায়?

সুমন নাথ

আমাদের দেশে যতজন চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করে থাকেন, তাঁদের অনেকেই আলুচাষের সঙ্গেই যুক্ত। অতিসম্প্রতি কৃষক এবং PEPSI Co-র মধ্যে আইনি লড়াই অনেকেরই চোখে পড়েছে। অনেকেই অবাক হয়েছেন এটা জেনে যে, কোনো বিশেষ ধরনের বীজকে নাকি পেটেন্ট-এর আওতায় আনা যায় এবং তার চাষ করার অধিকার যার কাছে পেটেন্ট আছে তিনি অনুমতি দিলে তবেই করা যায়। চাষিদের বিরুদ্ধে PEPSI Co-র অভিযোগ তাঁরা ওই ধরনের আলু অনুমতি ছাড়াই চাষ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, বিশ্বায়ন এবং ক্ষুদ্র চাষির ভবিষ্যৎ এক সূত্রে গেঁথে ফেলে। PEPSI Co-র সাপ্লাই চেন এবং প্রথাগত আলু চাষের সাপ্লাই চেনের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথাগত আলু চাষে ফড়েদের ওপরে প্রান্তিক চাষি নির্ভর করে থাকেন। তাঁরাই আলুকে চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন এবং প্রায় বেশিরভাগ সময়েই এঁরা কোনো না কোনো স্টোরেজ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং ধীরে ধীরে একটি এলাকার প্রায় সমস্ত আলুর ওপরে কব্জা করে ফেলেন। কব্জা করতে পারেন কারণ তাঁরা চাষিদের স্টোরেজ মালিকের হয়ে ঋণ দেন, জল ইত্যাদিও ধারে প্রদান করেন এবং বিনিময়ে ফসল প্রায়শই জলের দরে কেনেন। PEPSI Co অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে আলু সংক্রান্ত ভোজ্য পণ্য তৈরি করে। ওঁদের চিপস বা ফিঙ্গার চিপস তৈরি করার জন্য যে বিশেষ প্রজাতির আলু দরকার হয় তাতে সুগারের পরিমাণ কম থাকা জরুরি, কারণ তা না হলে ভাজার সময়ে ওই আলুগুলো লাল রং ধারণ করে। এই সুগারের পরিমাণ নির্ভর করে আলুর প্রজাতির জিনগত বৈশিষ্ট্য, ফসল তোলার আগের কিছু অবস্থা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির ওপরে। PEPSI Co-র সাপ্লাই চেনে ভেন্ডর-এর উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেন্ডর হলেন কোম্পানি নিযুক্ত স্থানীয় ব্যক্তি। ভেন্ডর সরাসরি চাষ পর্যবেক্ষণ করেন এবং যে-কোনো সমস্যায় কোম্পানিকে জানান। কোম্পানি এই চাষ ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু কৃষি বিজ্ঞানী নিয়োগ করেছেন এবং ওই ভেন্ডর সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং চাষিদের কাছে চাষের খুঁটিনাটি তথ্য পৌঁছে দেন। বর্তমানে PEPSI Co চাইছেন তাঁদের আলু চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের লক্ষ বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে এই চুক্তি ভিত্তিক চাষের মডেল ছড়িয়ে দেওয়া।

প্রসঙ্গত আলু চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি এই চুক্তিভিত্তিক চাষে তাঁদের লভ্যাংশ প্রথাগত পদ্ধতিতে করা চাষের থেকে খানিকটা বেশি, কিন্তু ঝক্কি অনেক। লাভ কেমন? ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী এক হেক্টর জমিতে আলু চাষের জন্য চুক্তি ভিত্তিক চাষে খরচ হয় প্রায় ৭৫০০০ টাকা মতো, আর সাধারণ চাষে তা প্রায় ৬৩০০০ টাকা। লাভ থাকে চুক্তি ভিত্তিক চাষে ২৮০০০ ১১২০০০ টাকা আর প্রথাগত চাষে ২০০০০ থেকে ১০০০০০ টাকা প্রায়। এই তারতম্য হয় আলুর দামের ওঠানামা, ফলনের পরিমাণ এবং গুণগত মানের ওপরে। কোম্পানি চাষিদের ফসল এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত বিমা করিয়ে রেখেছেন যা সাধারণ চাষির চাষের ঝুঁকি অনেকাংশেই কমিয়েছে। বেশকিছু সুবিধে সত্ত্বেও অনেকেই এই চাষে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। এর পেছনে বেশকিছু কারণ আছে। প্রথমত, এই ধরনের আলু 'সুখী' প্রকৃতির। এমনিতেই আলু আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্যে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই আলুর জন্য নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে নির্দিষ্ট ইনপুট সুনিশ্চিত করা আবশ্যিক। গ্রামস্তরে অনেক সময়ে কৃষক চাইলেও সমস্তরকমের ব্যবস্থার অভাবে সেই সকল অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ প্রয়োগ করে উঠতে পারেন না। সময়ে শ্রমিক জোগাড় করা, কিংবা রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদির জোগান, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানও সব সময় থাকে না। দ্বিতীয়ত, এই চাষের কাজের জন্য যে ইনপুট দেওয়া

হয় তা মূলত ঋণ হিসেবে দেওয়া হয় (শুরুর দিকে বিনামূল্যে দেওয়া হত বলে শুনেছি), এবং ফসল জমা করার পরে সেই ফসল গুণমানের বিচারে 'পাস' করলে তবেই মূল্য পাওয়া যায়। এবং এই মূল্য প্রারম্ভিক ইনপুট বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অনেক সময়ে ফলন আশানুরূপ না হলে অনেক পরিশ্রম করেই উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, গুণমানের বিচারে যে সমস্ত আলু নির্বাচিত হয় না, তাদের চাষিদেরকেই খোলা বাজারে বিক্রয় করার দায়িত্ব নিতে হয়। সেখানে ফড়েদের সঙ্গে প্রায়শই সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং চাষিদের অনেক কম দামে সে আলু ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ যে আলুকে সাধারণ আলুর থেকে অন্তত দ্বিগুণ যত্ন নিয়ে ফলাতে হল সেই আলুর একটা বেশ বড়ো অংশকে জলের দরে বিক্রি করতে হচ্ছে। এসব হিসেব একসঙ্গে করলে লভ্যাংশ আদপে কমেই আসে। চতুর্থত, আলুর জোগান বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অন্তত চাষিদের নানাভাবে বোঝানো হয় যেন তারা শীতকালীন আলু চাষের আগের যে ধান চাষ করবেন তা যেন কম সময়ে ফলে এমন প্রজাতির চাষ করেন।

সিঙ্গুরের এক চাষির মতে মূল সমস্যা হল স্বাধীনতার অভাব। চাষিরা এমনিতেই ফড়েদের জন্য আলুচাষে প্রবল ঝুঁকির আশঙ্কায় থাকেন এবং নানাভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হন, এই চাষে সমস্যা আরো বাড়ে বই কমে না। সুতরাং PEPSI Co-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চাষ করে যে দরিদ্র চাষির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যাবে সে গুড়ে বালি। উপার্জন খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি, কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও তার বিনিময়ে যে শ্রম এবং সময়ানুসারে ব্যবস্থা নিতে হয় তাতে খুব একটা 'পড়তায় পোষায় না'।

তা হলে প্রশ্ন দুটি, (১) কী কারণে চাষিরা ওই নির্দিষ্ট পেটেন্ট করা আলু চাষ করলেন? (২) যদি যুক্তি ভিত্তিক চাষেও এই দুর্দশা হয় তবে কি কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগের কোনো সুফলই চাষি পাবেন না?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে। চাষিদের নিজেদের মধ্যে শস্যবীজের বিনিময় এক সুপ্রাচীন প্রথা এবং এই বীজের বিনিময় এভাবে যদি ঘটে থাকে তা আশ্চর্যের একেবারেই নয়। যেখানে শহুরে উচ্চশিক্ষিত মানুষই ফসল যে পেটেন্ট করা যায় তা জানেন না, সেখানে সাধারণ চাষি তা জানবেন একথা ধরে নেওয়া যায় না। কোনো বিশেষ প্রজাতির বীজ বা লাইভস্টক যদি টারগেটেড স্কিম পদ্ধতিতে দেওয়া হয় তা সামাজিক বিনিময়ের পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে এই নজির বিশ্বজনীন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির কোনো সোজা উত্তর কারোরই জানা আছে বলে মনে হয় না। চুক্তি ভিত্তিক চাষে চাষি উপকৃত হয়েছেন এই নজির যেমন প্রচুর আছে তেমনই এই চাষের ফলে ফসলের বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, চাষি বঞ্চিত হয়েছেন, খাদ্যের ভারসাম্য ব্যাহত হবার উপক্রম হয়েছে এমন ঘটনাও জানা যায়। রাষ্ট্র যদি তার ক্ষমতাবলে এই ধরনের বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক স্বার্থ এবং খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত না করতে পারে তবে চিপসের প্যাকেট খোলার সময় স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই আমরা খাদ্যসুরক্ষা সহ কৃষকের জীবনের প্রতি অনেকখানি অবিচার করে ফেলব।

নিবন্ধটি ভারতে লকডাউন পর্ব শুরু হওয়ার আগে রচিত। —সম্পাদক

আত্মনির্ভর নামে ভণ্ড প্যাকেজ

সাদ্দাম হোসেন মন্ডল

বাঃ কী সুন্দর নামকরণ! নাম দিলেন আত্মনির্ভর আর বেসরকারিকরণ করে দিয়ে আমাদের করে দিলেন পরনির্ভর। কয়েক দিন ধরে দেশের অর্থমন্ত্রীর আত্মনির্ভর প্যাকেজ শুনতে থাকলাম আর ভাবতে থাকলাম ইনি শিক্ষক হলে ছাত্রদের কপালে দুঃখ ছিল। মিডিয়ার সামনে যেভাবে উলটো পালটা বকতে শুরু করেছিলেন উনি তা বলার নয়, বললেন যাদের আয় ৬ লক্ষ টাকার নীচে তারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাহলে ভাবতে পারছেন, যে ব্যক্তি দেশের দারিদ্র রেখা সম্পর্কে জানে না সেই ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রী করা হলে কী হাল হবে দেশের?

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ এনেছে সরকার। আচ্ছা আপনার মনে হয় দেশের প্রান্তিক শ্রেণির লোক এই বক-বক বুঝতে পেরেছে? সরকার ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প নিক আর ১০০ লক্ষ কোটির প্রকল্প নিক কৃষি শ্রমিকের মাইনে ২২০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০০ টাকা হবে না, এটা শ্রমিকরা জানেন খুব ভালো করে। এর মধ্যে আবার কৃষি ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কৃষির উন্নতির জন্য। এই এক লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ কৃষকের দুর্দশা ও দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে বলে আপনার মনে হয়? তাহলে একটু পিছনে গিয়ে দেখতে হয় সরকারের বিভিন্ন প্যাকেজ কৃষক সমাজের কোনো উন্নতি করতে পেরেছে কিনা? ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮-এর বাজেটে অরুণ জেটলি কৃষকদের জন্য কয়েকটি বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র দলিল হয়ে থাকল, বাস্তবে সেইভাবে কার্যকরী করল না কেন্দ্র সরকার। দেশের অর্থমন্ত্রী চতুর্থ দফার প্যাকেজ ঘোষণা করলেন, তিনি বললেন আগামী কয়েক বছরে কৃষি উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। এই ঘোষণা শোনার পর চাকুরিজীবী ও ঠান্ডা ঘরে বসে থাকা লোকগুলি বলতে থাকবে মোদীবাবু কৃষক সমাজের জন্য প্রচুর কিছু করেছে। উনি দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু সত্যি কি তাই?

সত্যিই কি চাষিদের কোনো উন্নতি করতে পারবে? এই প্যাকেজ? যে ক্ষেত্রে টাকা খরচ করার কথা বলা হয়েছে, সেটা হল কৃষি পরিকাঠামো-এর উন্নতি ও স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ানোর কথা। কিন্তু কৃষি পণ্যের দাম বা কৃষি ঋণের ব্যাপারে কোনো কথাই বললেন না অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী বললেন সবজি উৎপাদন করে বাইরে বিক্রি করলে ৫০ শতাংশ পরিবহনের খরচ বহন করবে সরকার। এর ফলে কৃষক সমাজ উপকৃত হবে বলে আমার মনে হয় না। কৃষকের মূল সমস্যা হল কৃষিপণ্যের দাম না পাওয়া ও উপকরণের উচ্চ দাম। সরকার কৃষির মূল্য সমস্যার দিকে আলোকপাত না করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। ২০১২ সাল থেকে কেন্দ্র সরকার রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণের উপর ভর্তুকি তুলে দিতে শুরু করেছিল। তাই চাষিরা ভেবেছিলেন কেন্দ্রের নতুন সরকার এলে আবার শুরু করবে ভর্তুকি। কিন্তু এই সরকার পুরো ভর্তুকিটাই তুলে দিল। ২০১২ সালে যে D.A.P. প্রতি বস্তায় ৪৫০ টাকা দরে কিনতে হত সেটা বর্তমানে চাষিদের কিনতে হচ্ছে ১,২৫০ টাকায়। Urea বর্তমানে ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৫০ টাকা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাসায়নিক সারের দাম প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কৃষি পণ্যের দাম না বাড়ার জন্য তাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এক চরম ক্ষতির। অন্য কোনো পেশা না থাকার জন্য কৃষকদের চাষ করেই জীবন-যাপন করতে হয়। কিন্তু চরম ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে তাদের ঋণ নিতে হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকে। ফসল উৎপাদন করে বাড়ি আনার সঙ্গে সঙ্গেই মহাজনদের টাকা ফেরত দেওয়ার চাপ পড়তে শুরু করে। তখন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অন্য কোনো রাস্তা না থাকার জন্য সেই উৎপাদিত ফসল অতি কম দামে বিক্রি করে সেই টাকা সুদ সমেত ফেরত দিতে হয়। ছোটো ও প্রান্তিক চাষিরা তাদের ফসল সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না, অর্থনৈতিক দুরবস্থা থাকার জন্য। এই সুযোগ নিয়ে ফাটকা কারবারিরা সেই ফসল কৃষকের কাছ থেকে অতি কম

দামে ক্রয় করে সংরক্ষণ করে রাখে এবং বাজারের চাহিদা নিরিখে তারা কম সামগ্রী যোগান দিয়ে এক কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি করে। ফল স্বরূপ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে প্রচুর পরিমাণ মুনাফা আত্মসাৎ করে থাকে এই কালোবাজারির দল।

পরিবহনের উপর যে ব্যয় ছাড়ের কথা এই প্যাকেজে বলা হয়েছে সেটাও বড়োলোকের পক্ষে। দেশের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি তারা তাদের সবজি বাজারে গিয়ে বিক্রি করে না, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য জমির মধ্যেই বা গ্রামেই বিক্রি করে দেয় সেই আড়তদার বা কালোবাজারিদের কাছে। তাহলে বুঝতে পারছেন পরিবহনের এই সুবিধাটাও গেল ওই মিডিল ম্যান বা কালোবাজারির হাতে। সরকারের এই স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ানো বা পরিবহনের ওপর ছাড় দেওয়াটা কোনোভাবেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের উন্নতি করতে পারছে না। অথচ অর্থনৈতিক দিক থেকে আরো প্রভাবশালী হতে শুরু করবে এই কালোবাজারি ও পুঁজিপতির দল।

আমার তো মনে হয় এই প্যাকেজ কৃষি উপকরণের দাম কমানো ও ফসলের দাম বাড়ানোর পন্থা অবলম্বন করলে ক্ষুদ্র চাষিরা উপকৃত হত এবং তারা আরো চাষে উৎসাহিত হত। এই কথাগুলো পড়ার পর কিছু সরকার ভক্ত বলবেন সরকার তো ব্যবস্থা করেছেন কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার, তাহলে কেন কৃষক মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেবে? ভারতের বেশির ভাগ কৃষক ক্ষুদ্র চাষি, তারা ক্ষুদ্র জমির মালিক, তারা কোনো মতে সেটা হারাতে চায় না। কিন্তু কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড করতে হলে তাদের জমির দলিল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। এই জমির দলিল জমা দেওয়ার কথা থাকার জন্য ক্ষুদ্র চাষিরা ভয় পায় যদি তাদের জমি চলে যায়। অন্যদিকে ভাগ চাষিদের জমির মালিকানা থাকে না, তার ফলে তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ভক্তরা এইসব জেনেও না জানার ভাণ করেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী আগে ঘোষণা করেছেন যে ভারতের কৃষকের আয় দ্বিগুণ বেড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যের কৃষকের আয় তিনগুণ হয়েছে। এই সত্যতা যাচাই করার জন্য, আমি বর্ধমান জেলার এক উন্নত কৃষি প্রধান জায়গা শিড়রাই গ্রাম যেটা গলসি ১ নম্বর ব্লকে অবস্থান করে সেখানে সমীক্ষা করি। কৃষি সমীক্ষার শেষে যেটা উঠল সেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে শ্রমিক ও কৃষকের পরিশ্রমের হিসেব করা যায় না।

এক বিঘা জমিতে গোটা বছর ধান চাষ করে কৃষকের আয় হয় ২৩,৪০০ টাকা। এক বিঘা জমি চাষ করতে কৃষকের ব্যয় হয় প্রায় ১৮,৫০০ টাকা। তাহলে এক বিঘা জমি চাষ করে কৃষকের বছরে মাত্র ৪,৯০০ টাকা লাভ হয়। আর যদি পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার মতো জায়গার কথা বলেন যেখানে একবার চাষ হয় তাহলে বুঝতে পারছেন তাদের কী অবস্থা হবে। যদি কোনো কৃষকের দুই বিঘা জমি থাকে তাহলে বছরে তার আয় ১০,০০০ টাকা। এই লাভ সম্ভব যদি প্রকৃতি কৃষকের সহায় হয়, তাহলে। কিন্তু যদি আউশ গ্রামের বাদল কিস্কুর মতো প্রতি বছর বন্যার জলে ধান চলে যায় তাহলে লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতি হবে। বাদলের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়, দু-বেলা খাবার জোটে না তার ঠিকভাবে কারণ তার জীবনে কুনুর নদী অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছে। এই লকডাউনের বাজারে কত দিন যে না খেয়ে থাকতে হয়েছে তা মুখটা দেখলেই বোঝা যায়। বলুন প্রধানমন্ত্রীজি কীভাবে কৃষকের আয় দ্বিগুণ হল? ৬ জনের কোনো পরিবার এই টাকায় গোটা বছর চালাতে পারবে?

তাও তারা সবকিছু হাসি মুখে মেনে নিয়েছিল কারণ, ২০০৬ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং শুরু করেছিলেন ১০০ দিনের কাজ। এই কাজ করে বেশ ভালোভাবেই চলছিল কৃষকের জীবনযাপন। কিন্তু ২০১৪ সালে মোদী সরকার আসার পর তা আস্তে আস্তে বন্ধ করতে শুরু করে। তার ফলস্বরূপ কৃষকদের চাষ ছেড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য পরিযায়ী শ্রমিকের পথ বেছে নিতে হয়। আজ আবার দেখলাম দেশের অর্থমন্ত্রী সেই ১০০ দিনের কাজকেই গুরুত্ব দিচ্ছে মানুষের আয় বাড়ানোর জন্য। তাহলে আস্তে আস্তে বন্ধ করতে শুরু করেছিলেন কেন? কংগ্রেস সরকার করেছে বলে?

অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে কৃষকের অবস্থা বর্তমানে আরো খারাপের দিকে, তার ফলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। National Crime Records Bureau-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের পর থেকে প্রায় ২,৯৬,৫০০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আর করবে নাই-বা কেন? যদি ২ টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি করতে হয় তাহলে আর কী রাস্তা আছে ওদের জীবনে? ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ শুনে ভেবেছিলাম হয়তো প্রধানমন্ত্রী নতুন কিছু করতে চলেছেন। কিন্তু এটাই দেখলাম তিনি গরিবের জন্য নন। এর আগে তিনি ১,৭০,০০০ কোটি টাকার এক গরিব কল্যাণ প্যাকেজের ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে বলেছিলেন প্রতি পরিবারকে মাথাপিছু ৫ কিলো চাল ও ১ কিলো ডাল দেওয়ার কথা। কিন্তু যখন রেশনের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করা হল সব জায়গায় দেখা গেল ৫ কেজি চাল পেয়েছে কিন্তু দেখা পায়নি ডালের। মাথাপিছু ২৫০ টাকার প্যাকেজ করেছিলেন চাল ও

ডাল মিলিয়ে। কিন্তু ডাল না দেওয়ার জন্য সেটা কমে ১৫০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ালো। তাহলে আপনি মাত্র ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করলেন ৯০ শতাংশ লোকের জন্য। আর বাকিটা আপনার বন্ধুদের জন্য?

দেশের নতুন আইনে বলা হল, যে কেউ যত খুশি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত করতে পারে। একমাত্র জরুরি অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য মজুত করা যাবে না। দেশের সরকারপক্ষ জানে যে দেশের মিডিল ম্যান বা কালোবাজারির সংখ্যা প্রচুর তা সত্ত্বেও এইরকম একটা আইন নিয়ে এসে কি তাদের আর একটু সুবিধা করে দিল না সরকার? এই আইনের ফলে হয়তো জনগণকে পরের বছর বহু টাকা বেশি দরে পেঁয়াজ ও আলু কিনতে হতে পারে। কারণ কালোবাজারিরা আগে থেকেই সমস্ত ফসল মজুত করে এক কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি এবং বাজারে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুটবে। এই আইন ও ভিত্তিহীন জনসাধারণের ছাড়া ভালো কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না।

এবার আসি MSME ক্ষেত্র সংক্রান্ত আলোচনায়। সেখানে বলা হয়েছে ৩ লক্ষ কোটি টাকা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হল। সমস্ত MSME শিল্পগুলি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। এই প্যাকেজের সুবিধা নিয়ে কিছু পরিমাণ মৃতপ্রায় শিল্প ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে নেবে এবং পরবর্তীকালে সেই টাকা শোধ দিতে না পারার ফলে ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়বে। শুধু তাই নয়, MSME-এর সংজ্ঞা পালটে দেওয়ার ফলে এই ঋণের সুবিধা পাবে আসলে বড়ো শিল্পপতিরা।

এই প্যাকেজে সরকার শিল্পক্ষেত্রকে ঋণ দেওয়ার কথা বলেছে, কিন্তু জনসাধারণের আয় বাড়ার কোনো সুনিশ্চিত প্রকল্প নেননি। ফলস্বরূপ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদিত পণ্য ভোগ করার কোনো লোক থাকবে না। শিল্পক্ষেত্রে অতি যোগান সমস্যা দেখা দেবে তার ফলে শিল্পক্ষেত্রগুলি এক চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে প্রচুর পরিমাণ কর্মী ছাঁটাই করবে এবং অর্থনীতিতে এক চরম বেকার সমস্যা দেখা দেবে। কারণ এই প্যাকেজে শুধুমাত্র যোগান বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে চাহিদার দিকটি সরকারপক্ষ বিবেচনা করেননি।

এই যে কুড়ি লক্ষ টাকার প্যাকেজ, এই প্যাকেজের মূল লক্ষ্য ছিল করোনা ভাইরাসের সময়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। কিন্তু অর্থমন্ত্রী ভাষণে যেটা শোনা গেল এই কুড়ি লক্ষ টাকার প্যাকেজটা তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। আপনি মনে করুন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় যাচ্ছেন হঠাৎ কোনো এক খালের মধ্যে আপনার গাড়ি পড়ে গেল, সেই তৎকালীন সময় আপনি কী করবেন? গাড়িটাকে খাল থেকে তুলবেন, নাকি গাড়ি রাস্তায় পড়ে থাক, সামনের ৫ কিলোমিটার রাস্তাকে সরানের কথা ভাববেন? এই সরকার এখনকার পরিস্থিতির কথা না ভেবে ভবিষ্যতে ঋণ দেওয়ার কথা ভাবছে।

ভাষ্য, বিকল্প ভাষ্য, লিটল ম্যাগাজিন

সৌম্যজিৎ রজক

‘লিটল ম্যাগাজিন’ শব্দবন্ধটি যতটা পরিচিত, কাকে বলব ‘লিটল ম্যাগাজিন’ সেইটে বোধহয় ততটা স্পষ্ট নয়। যেকোনো সাময়িকীপত্রই কি লিটল ম্যাগাজিন? নাকি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত ‘লিটল ম্যাগাজিন মেলা’-য় কিংবা কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলার ‘লিটল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়ন’-এ যেসব পত্রিকা বিক্রি হয়, কেবল তারাই? একটু বেয়াড়া শোনালেও প্রশ্ন করতেই হয়, তারাও কি প্রত্যেকেই লিটল ম্যাগাজিন? গোল বাঁধে ম্যাগাজিনের আগে ‘লিটল’ শব্দটা নিয়ে। বাংলায় কি তবে ‘ছোটো পত্রিকা’? ছোটো মানে কি বহরে ছোটো? রোগা, ছিপছিপে? জৌলুসহীন, ম্যাড়মেড়ে? অর্থকষ্টে নিয়মিত প্রকাশে অপারগ?

কেউ বলবেন, ‘অবাণিজ্যিক’ পত্রিকা! তাহলে কেন সেই পত্রিকার গায়ে লেখা থাকবে ‘বিনিময় মূল্য’? কেন বিক্কিরি হবে? ইস্কুলে কিংবা লাইব্রেরিতে যেসকল ‘দেওয়াল পত্রিকা’ টাঙানো দেখেছি, তাদের গায়ে কখনো ‘বিনিময় মূল্য’ দেখিনি। এইসব পত্রিকা পড়া যায় আক্ষরিক অর্থেই বিনামূল্যে। এগুলিই তো ‘অবাণিজ্যিক পত্রিকা’র খাঁটি উদাহরণ। দেওয়াল পত্রিকাকে তো ‘লিটল ম্যাগ’-এর চৌহদ্দিতে ধরা হয় না কখনো।

তাহলে কি এমন কোনো শর্ত আছে, যেখানে পত্রিকাটি বিক্রি হবে কিন্তু এতটাও বিক্রি হবে না যাতে সম্পাদক ছাপানোর খরচ তুলতে পারেন? কেননা পত্রিকাটি বিক্রি করে সম্পাদক যদি তার ছাপানোর খরচ তুলে ফেলেন তাহলে অর্থকষ্টে পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ আটকে যাবে না! ফলে অনিয়মিত প্রকাশের শর্তটি পূরণ হবে না! প্রতি সংখ্যায় ২০-২২টি ছোটো কবিতা ছাপা কোনো পত্রিকা কোনো দিন ৫০টি কবিতা ছেপে গায়ে-গতরে একটু মোটা হয়ে গেলেই আর ‘লিটল ম্যাগাজিন’ থাকবে না? অথবা পঙ্‌ক্তিচ্যুত হবে সেই লিটল ম্যাগাজিনটি, যথেষ্ট ম্যাড়ম্যাড়ে নয় যার প্রচ্ছদ? এজাতীয় দাবি কেউ উত্থাপন করলে, নিশ্চিতভাবেই সেসব অসাড় এবং যুক্তিহীন বলে আমরা সরিয়ে রাখব।

উনিশ শতকে মার্কিন দেশে (কিছু পরে ইংল্যান্ডেও) এমন কিছু সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়, যারা নিজেদের ‘লিটল ম্যাগাজিন’ হিসেবে চিহ্নিত করে। তখন থেকেই একে সংজ্ঞায়িত করার নানান চেষ্টা হয়েছে। নানান সময়ে। যদিও দুনিয়ার অধিকাংশ জিনিসের মতো কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলা যায়নি লিটল ম্যাগাজিনকে।

প্রসঙ্গত এমন কিছু ধারণার কথাও কখনো কখনো শোনা গেছে, যা আপাতভাবে গাজোয়ারি মনে হবে। যেমন, সেই পত্রিকাই ‘লিটল ম্যাগাজিন’ আখ্যায়িত হতে পারে যার প্রচারসংখ্যা (সারকুলেশন) ২০০ থেকে ২০০০ কপির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২১০০ হয়ে গেলেই যেন তার নাম কাটা পড়বে! তবে বোঝা যায় এই ধারণার আঁতের কথাটি হল, এ পত্রিকা ‘লিটল’ অর্থে আকারে নয়, প্রচারে ছোটো। সীমিত।

কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভবত সমস্ত লেখকই চান, তাঁর লেখা আরো বেশি পাঠক পড়ুন। নিজেদের রিলেট করুন তাঁর লেখার সঙ্গে। সম্ভবত সমস্ত পত্রিকা-সম্পাদকও চাইবেন, তাঁর পত্রিকা আরো বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছোক। প্রশ্নটা হল, আরো বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছোনোর জন্য লেখক নিজের লেখার বা সম্পাদক নিজের পত্রিকার মান ও চরিত্রের সঙ্গে আপোস করতে রাজি আছেন কিনা! যিনি আপোস করতে রাজি আছেন, তিনি জাহান্নামে যান! যিনি রাজি নেই, তিনি আছেন ‘লিটল ম্যাগাজিন’-এর ক্যাম্পে। বোধে এবং মেজাজে।

এতক্ষণে লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পেলাম আমরা। ‘বোধ’ এবং ‘মেজাজ’। ইহা এক অর্থে একটি নির্দিষ্ট বোধ। এবং এক মেজাজও বটে!

১৯৫৩ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে বাংলার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিটল ম্যাগাজিনের লক্ষ্য, চরিত্র, অনন্যতা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা লেখেন। বহু কথার মধ্যে না গিয়ে বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত একটি চারিত্র্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব আমরা। যে

সাহিত্যপত্র '...কখনো মন জোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিল'। অর্থাৎ যে মন ঢলে পড়তে চায় আফিমের নেশায়, তাকে আফিম আমদানি করা নয়; বিপরীতক্রমে তাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলা।

'জনরুচি'-কে রুষ্ট করার ঝুঁকি কেনই বা নেবে 'বাণিজ্যিক পত্রিকা'? তাতে যে তার ব্যাবসা মার খাবে বড়ো! এই একই কারণে 'জনরুচি'-কে তুষ্ট করার দায় থাকে না লিটল ম্যাগাজিনের। কেননা বাণিজ্য-সফল হবে বলে সে ভূমিষ্ঠ হয়নি। এই অর্থেই সে 'বাণিজ্যিক পত্রিকা' নয়। পত্রিকা বিক্রি করবে না বা বিক্রি করে ছাপার খরচ তুলবে না, এমন দাবির সামনে লিটল ম্যাগাজিনকে দাঁড় করানো অন্যায়। এমনকী কখনো যদি কোনো লিটল ম্যাগাজিন লাভের মুখ দেখে, সেটা আপত্তির নয়, আহ্লাদেরই কারণ হবে। এক্ষেত্রেও প্রশ্নটা হল, লাভের অঙ্ক কষে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে কিনা! প্রকাশের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মুনাফাই হয়ে উঠছে কিনা!

প্রকাশের পেছনের প্রশ্নটি অর্থনৈতিক নাকি রাজনৈতিক? মুনাফা নাকি মন জাগানো?

সারকুলেশনের ফেলে আসা প্রশ্নটা এইখানে ফিরে আসে। সারকুলেশনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থকরি দিকটিও, যেহেতু পত্রিকাটি নগদ পয়সায় বিক্রি হয়। এখন বিক্রিই যদি হয় মূল উদ্দেশ্য, ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নামজাদা সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশই অধিক নিরাপদ। চেনা ছকের বাইরে নতুন কোনো ভাষার খোঁজও সে করবে না, নতুন কোনো কথা কইবার চেষ্টাও করবে না। পরীক্ষামূলক লেখা প্রকাশের কথা তো ছেড়েই দিলাম! ঠিক এই জায়গাটাতেই লিটল ম্যাগাজিনের মূল চরিত্রটি নির্ধারিত হয়ে যায়।

এ পত্রিকার ঝোঁক বরাবরই চিরাচরিত, প্রথাগত সাহিত্যের বদলে অন্য অর্থ, অন্য ভাষা, আরেক রকম লেখার দিকে। তরুণ কোনো, হয়তো-বা একেবারে আনকোরা লেখককে, লিটল ম্যাগ তাই জায়গা করে দেয়। বড়ো কবিদের বাঁ-হাতে লেখা গুচ্ছের কবিতার তলায় এক কোণে নয়। সসম্মানে। নতুন স্বর ও স্বরক্ষেপ, নতুন চিন্তা ও চিন্তার প্রকাশের বিপুল সম্ভবনাকে ধারণ করে থাকে। এই হিম্মত ব্যাতিরেকে, কেবলই বইমেলার লিটল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়নে বসার অনুমতিপত্র জোগাড় করে নিলেই কেউ 'লিটল ম্যাগাজিন' হয়ে ওঠে না! বইমেলার ভিড়ে কী খুঁজছেন মাননীয় সম্পাদক, পাঠক নাকি কেবলই ক্রেতা?

লিটল ম্যাগাজিন ক্রেতার পরোয়া করে না। বরং টেবলের এপার-ওপারে সে চায় পত্রিকা-পাঠক সম্পর্ক। পণ্য-উপভোক্তা সম্পর্ক নয়। একারণেই প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন কখনোই লেখা জোগাড়, লেখা ছাপার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। একটি লেখক-সমবায় এবং পাঠকেরও সমবায় গড়ে তোলার কাজে সে রত থাকে। থাকতে হয় তাকে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই।

পত্রিকা সম্পাদনা একজনই করুন অথবা একাধিক ব্যক্তি, পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠতে চায়। আস্তে আস্তে একটি পাঠকগোষ্ঠীও তৈরি হয়। ম্যাগাজিনটিকে কেন্দ্র করে লেখক-সম্পাদক-পাঠক যে বৃহত্তর সমাবেশ প্রস্তুত হয়, নিজস্ব পরিসরে তা বহন করে এক বিশেষ দ্যোতনা। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যে 'জনরুচি' নির্মাণ করে এবং ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে না-পারা অপারপর বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলি যাকে লালন করে, সেই 'জনরুচি'-কে আঘাত করার মতো শক্তিও সে অর্জন করতে পারে কখনো কখনো।

আমাদের মনে পড়ে যাবে, ফাল্গুনি রায়ের কবিতার পঙ্‌ক্তি, 'ম্যাগাজিন শব্দটি আমি লক্ষ্য করেছি রাইফেল ও কবিতার সঙ্গে যুক্ত'। যেহেতু এটি কোনো সাধারণ বাক্য নয়, কাব্য; স্বভাবতই আক্ষরিক অর্থের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে জ্যোৎস্না। 'কবিতা'-র সঙ্গে যুক্ত 'ম্যাগাজিন' অর্থে যেকোনো সাহিত্যপত্রকে নয়, নির্দিষ্টভাবে আমরা বুঝে নেব লিটল ম্যাগাজিনকেই। আর লক্ষ্য করব উপমাটি আঁকা হবে রাইফেলের সঙ্গে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্যোতনায় পৌঁছে গেলে, খেয়াল করব, ম্যাগাজিন কীভাবে ধারণ করে রাখে যাবতীয় বিস্ফোরণের সম্ভাবনা। এবার কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা ছাড়া উপায় থাকবে না পাঠকের!

ইতিহাসের নানান বাঁকে-মোড়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলন। কখনো উচ্চকিতভাবে, কখনো খানিকটা নিচুগলায় কিংবা নীরবেই। হাংরি প্রজন্মের উদাহরণ যেমন রয়েছে আমাদের সামনে, 'শ্রুতি' কিংবা 'শাস্ত্রবিরোধী'ও রয়েছে। কিন্তু যদি বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের গোড়ায় 'সাধনা'-কে ধরি, সেও তো এক অর্থে আন্দোলনই যা প্রশস্ত করবে নতুন গদ্যরীতির পথ। রাস্তা কেটেই নতুন রাস্তা তৈরিতে ব্রতী হবেন খোদ রবি ঠাকুরও। আবার সেই রবীন্দ্রনাথেরই অমোঘ ছায়া থেকে সরে আসার আপ্রাণ তাগিদে ছটফট করবে 'কল্লোল'। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দ্রোহের একটি সময়পর্বই চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই লিটল ম্যাগাজিনটির নামে। কল্লোলের কাল পেরিয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবে 'আধুনিক' বাংলা কবিতা। 'ক্ষুধার্ত', 'শ্রুতি', 'শাস্ত্রবিরোধী'-র মতোন উচ্চকিত না হোক, বাংলা কবিতার এই দৃশ্যান্তর নিশ্চিতভাবেই এক আন্দোলন। ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। আর তাতে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেবল পত্রিকাই নয়, ‘কবিতা-ভবন’ থেকেই একে একে প্রকাশিত হবে জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের প্রথম কবিতা বই। বাংলা কবিতা পড়ার তাবৎ অভ্যেসকে যে কবিরা পালটে দিচ্ছিলেন নতুন নতুন মোচড়ে। অলিতে গলিতে ছড়ানো-ছিটানো সেই ইতিহাস বাতলানো এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল দেখতে চাইছি, সময়ের ধারাবিবরণীর পরিবর্তে লিটল ম্যাগাজিন কীভাবে সময়কে নির্মাণও করে।

ইত্যবসরে একটি কথা বলে রাখা দরকার। মুহুর্মুহু কোনো না কোনো বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন ঘটে চলেছে এবং প্রতিটি লিটল ম্যাগাজিনই কোনো-না-কোনো বিশেষ আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, এমন সরলীকৃত ধারণার অবকাশ নেই। কেবলই ভালো লেখা প্রকাশ করব বলে ছাপা হয়, হচ্ছে বহু পত্রিকা। এবং সেইটেই নিজের কাছে যেকোনো লিটল ম্যাগের প্রাথমিক চাহিদা হওয়ার কথা। তথাপি সমাগ্রিকতায় লিটল ম্যাগাজিন নিজেই একটি আন্দোলন। কোনো বিশেষ কালপর্বে কিংবা বিশেষ চরিত্রে নয়। সামগ্রিকতায়।

প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ভাষ্যের বিপ্রতীপে বিকল্প ভাষ্যের খোঁজ। বাণিজ্যিক পত্রিকা লালিত ‘জনরুচি’-র বিপ্রতীপে ভিন্ন রুচির চর্চা। এই চর্চার প্রশ্নে স্বভাবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লিটল ম্যাগাজিনগুলি একে অন্যের কাঁধে কাঁধ সহযোদ্ধা। কোনো যান্ত্রিকতার শিকার হয়ে সকলে কাল থেকে একইরকম লেখালেখি প্রকাশ করতে শুরু করে দেবেন, এটা কোনো কাজের কথা নয়। কাঙ্খিতও নয়। বরং কেন্দ্রবর্তী প্রতিষ্ঠান যখন একটি নির্বিকল্প অনন্য স্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন বহুত্বের অনিবার্য দাবিকে মূর্ত করে লিটল ম্যাগাজিনগুলি।

কোনোটা কোচবিহার থেকে, কোনোটা মুর্শিদাবাদ, মালদা, বর্ধমান থেকে, কোনোটা-বা বাঁকুড়া কী বীরভূমের গ্রাম থেকে, কোনোটা কলকাতা লাগোয়া শহরতলি কিংবা খোদ কলকাতা থেকেই প্রকাশিত। ফলত লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের কলিকাতাকেন্দ্রিক ভাষ্যের সামনেও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে আছে।

‘একজন প্রৌঢ় কবি ছাদ থেকে ঝুঁকে পড়ে / দেখছেন কবিতাগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে কলকাতার দিকে...’! ‘গোধূলীর ধারাভাষ্য’ নামে কবিতায় লিখেছেন শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। এই আক্ষেপোক্তির সামনে দু-দণ্ড দাঁড়াব না আমরা?

অনিবার্য কার্যকারণেই আমাদের কবিতা যখনই ‘আধুনিক’ হয়েছে, তখনই তাকে জড়িয়ে ধরেছে নাগরিকতা। তবে কবিতাচর্চা যেভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক এবং ক্রমে কলকাতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে, তা যতটা না অনিবার্য তারচেয়ে বেশি ট্র্যাজিক। মুখ্যত যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলা সাহিত্যকে, সে কেবল সাহিত্যের সাধারণ মান্যরূপই বেঁধে দেয়নি, কে কবি আর কে কবি নয় সেইটেও কার্যত ঠিক করে দিতে থেকেছে। কলেজস্ট্রিট-স্থিত সদরদপ্তর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের লেবেল সাঁটা কবিতাগুলি। আর আপামর বাংলা পাঠক-সমাজ জেনেছে, এইটেই কবিতা! আর কিছু নয়! এই ছকের বাইরে যারা, তাদের স্বর হারিয়ে গিয়েছে কেবল! কেবলই থেকে গিয়েছে পর্দার আড়ালে। এহেন কবির পক্ষে পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত সাহস দেখানোর অবকাশ ছিল। কিন্তু বই ছাপানোর জন্যে সেই কেন্দ্রবিন্দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেই হত তাঁকে! খুব প্যাঁচ কষে বড়োজোর বড়ো কবির ঘর অব্দি ঘুরঘুর। বড়ো, তা সেই কবিও যতোই বড়ো হোন, প্রতিষ্ঠানের সামনে তো সামান্যই। চক্করটি মোটের ওপর এরকমই। মোদ্দা কথাটা হল, একচেটিয়া কর্তৃত্ব। যার দাপটে একটি ব্যবসায়গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে যুগপৎ লেখকের লেখা এবং পাঠকের পড়াকে।

অসম এক যুদ্ধে জেদ নিয়ে লড়ে গেছে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন। ‘অসম’ কারণ পুঁজি। একচেটে পুঁজি। আর এই পুঁজির দাপটের কাছে এসেই কার্যত তার দৌড় ফুরিয়ে যেত একরকমভাবে। কেননা প্রতিষ্ঠানটি কেবল একটি মাসিক সাহিত্যপত্রই প্রকাশ করে না, তার আছে এক প্রকাণ্ড প্রকাশনা সংস্থাও। আর তার আশেপাশে, ওই কলেজস্ট্রিটেই, রয়েছে আরো একাধিক বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা। যারা প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মতাদর্শগতভাবে বিরোধী কোনো অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। ফলে প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ভাষ্যের থেকে খুব পৃথক বা এক্কেবারে বিপরীত কোনো ভাষ্য প্রকাশ তাদের সাহসে কুলোয় না।

সে হিম্মত দেখাতে হত লিটল ম্যাগাজিনকেই। গত শতকের নব্বইয়ের শেষদিক থেকেই বই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়াটা বাংলা লিটল ম্যাগের একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে উঠতে থাকল। কেননা এইটে তার অস্তিত্বের জন্য হয়ে উঠেছিল অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। বাংলা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠানের কেটে দেওয়া আঁকের বাইরে যে চর্চা সচল রেখেছে সাহিত্যের রক্তচলাচল, তাকে রক্ষা করার জন্যে। এগিয়ে দেওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে লিটল ম্যাগাজিনকে প্রকাশনা সংস্থা হয়ে উঠতেই হত, বিশেষত প্রযুক্তি যখন সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কেননা

সাহিত্য চিরস্থায়ীভাবে তার জমিদারি লিখে দেয়নি কোনো মাতব্বরকে।

নতুন একটি স্তরে প্রবেশ করছিল লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন। এবার সাহিত্যের 'বাজারে' একচেটে পুঁজির আস্ফালন, তার কর্তৃত্বকেও পড়তে হবে চ্যালেঞ্জের মুখে। দ্বিতীয়ত, এতদিন সে যা খাওয়াত, পাঠক তাই খেতে বাধ্য ছিল। এবার পাঠকের সামনে খুলে যেতে চলেছে এক অসীম সম্ভাবনার দিগন্ত। বাধ্য হয়ে ভুষি গেলার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন পাঠকও।

এবং ঘটলও তেমনই। খুব বেশি হলে সময় লাগল বছর দশেক। একুশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলায় সিরিয়াস সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রীয় জায়গাটি দখল করে নিয়েছে লিটল ম্যাগাজিন পাবলিকেশন। অন্তত নির্দিষ্টভাবে কবির তরতাজা কবিতা-ভাষাগুলি প্রশস্ত পথ পেল পাঠকের সঙ্গে কথা বলবার। বিপুল এক বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে উঠে দাঁড়াল নতুন শতাব্দীর বাংলা কবিতা। আরেকদিকে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীরা প্রকাশক হিসেবে পাঠকের সামনে নতুন করে তুলে ধরলেন সেইসব সাহিত্যিকদের, বাজারের চাপে যাঁদের লেখা যথেষ্টই অবহেলিত হয়েছে এতদিন। অতিসম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার অভিবাসী কবিদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে একাধিক পত্রিকায়। বই হয়েও বেরোচ্ছে। মোটের ওপর পত্রিকা হোক কী বই প্রকাশনা, এ এক প্রতিরোধ। আরো জোরালো হয়ে ওঠা প্রতিরোধ।

এক প্রকাণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বল লোকেদের লড়াই। এ আন্দোলন নিজের তাগিদে তাই সংগঠিত হতে চায়। কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়াই বিগত কয়েক বছর যাবৎ এ রাজ্যের বিভিন্ন কোণায় সংগঠিত হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন মেলা। সরকারি কোনো উদ্যোগ, এমনকী সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া। অন্য কোনো বেসরকারি সংস্থার কাঁধে ভর দিয়েও নয়। হুগলি, কোচবিহার, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়ার মফস্সল শহরগুলিতে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, শ্রমের সমবায়ে প্রতি বছর হয়ে চলেছে মেলা। কোথাও তিনদিন, কোথাও দু-দিনের মেলার জন্যে সারা বছরের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি। মানুষের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ, মেলার প্রচার, সেই শহরের এমনকী পাশের জনপদগুলিরও দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটানো, মেলার মাঠ সাজানো থেকে শুরু করে মেলায় অংশগ্রহণকারী পত্রিকার সম্পাদকদের জন্য থাকা খাওয়ার বন্দোবস্তের আয়োজন। যত্নের সঙ্গে নিজের পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজও আছে। এ কোনো সমান্তরাল বইমেলা বা বইবাজার নয়, নির্দিষ্টভাবে 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা'। নিজস্ব বোধ ও মেজাজেই নির্ধারিত তার চরিত্র। কারো অনুপ্রেরণার তোয়াক্কা তো সে করেই না, পাত্তা দেয় না কারো চোখ রাঙানিকেও।

মেলাগুলিতে অংশ নিচ্ছেন সারা বাংলার লিটল ম্যাগগুলি। যুগপৎ তাদের পত্রিকা ও বই প্রকাশনা নিয়ে। প্রথমত প্রান্তগুলিতে ছড়িয়ে থাকা ম্যাগাজিনগুলো অন্য প্রান্তে বসবাসকারী পাঠকদের কাছে পৌঁছে যেতে চাইছে। বাড়াতে চাইছে তার পরিসর। কেবল বাণিজ্য বিস্তার নয়। মেলা আয়োজনে নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা থাকলে, বিকল্প বয়ানের চর্চায় দায়বদ্ধতা থাকলে মফস্সলগুলিতেও তৈরি হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন স্বাদের লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকগোষ্ঠী। কিছু ক্ষেত্রে এমনকী উঠে আসছেন নতুন লেখকও। প্রমাণ করছে এই মেলাগুলি।

বিভিন্ন পত্রিকাগুলির, তাদের সম্পাদক-লেখকদের মধ্যেও তৈরি হচ্ছে সমন্বয়। এইখানেই জাগরুক হয় খানিক চিন্তার কারণও। কেবল লেখক-সম্পাদক যোগাযোগের মধ্যেই আটকে থাকছে না তো কোনো কোনো মেলা? অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো পত্রিকা! তোমার পূজার ছলে ভুলে থাকছে না তো তোমাকেই? পাঠক সমবায় গড়ে তোলার কাজটি অবহেলিত হচ্ছে না তো? মেলাগুলি এক অভূতপূর্ব সুযোগ হাজির করেছে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সামনে, বৃহত্তর এক লেখক-সম্পাদক-পাঠক সমাবেশের। পরবর্তী ধাপে যা কেবল প্রতিষ্ঠিত 'জনরুচি'-কে আঘাত করাই নয়, বিকল্প জনরুচি নির্মাণের ক্ষেত্রেও হয়ে উঠতে পারে কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে এখন তাই আগের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার পাঠককে খুঁজে বের করার কাজটি। সচেতনভাবে বিকল্প পাঠ-অভ্যেসের খোঁজ করা পাঠকেরও খুঁজে বের করা দরকার লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনীগুলিকে।

গোটা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, সেই অমোঘ ক্ষমতাকেন্দ্রটি থেকেই তখন নির্মিত ও প্রচারিত হচ্ছে নির্বিকল্প ভাষ্য। বয়ান। আন্তরিকভাবেই যদি প্রতিরোধ চাই, বিকল্প ভাষ্য চর্চাই পথ। বাংলা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে, সঙ্গতকারণেই শুরু করা চাই, অফুরান কথোপকথন। পাঠক, আপনারও।

সত্যজিতে 'মধ্যবিত্ত'-র ছবি

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট

বেঁচে থাকলে একশো-তে পড়তেন। সত্তরে ইতি টেনেছেন জীবনের। তবু তাঁর বাঁচা থামলো না। জীবনের সত্যান্বেষণে যে সোনা মানিকের সন্ধান পেলেন, তাই তাঁকে অমরত্ব দিল। সিনেমা যতদিন বাঁচবে সত্যজিতের মৃত্যু নেই। বাংলা ছায়াছবির তিনি যে প্রাণপুরুষ, প্রধান হোতা, একথা উল্লেখের জন্য আজ আর নিবন্ধ ফাঁদতে হয় না। তাঁকে মহান প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। বরং জীবনকে চিনতে, তার লীলা রহস্যের হদিস পেতে, বড়ো শিল্প এবং মহৎ শিল্পীর সন্ধান পেতে, আমাদের নিজেদের জন্যই বার বার তাঁর ছবির কাছে যাওয়া দরকার।

মহৎ শিল্পী মানেই যে সারা কর্মজীবন প্রশ্নহীন থাকেন এমন নয়, বরং মাঝে মাঝে মহৎ প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয় তাঁকে। সত্যজিতের বেলাতেও তাই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেও তা করতে হয়েছে। তর্কটা মূলত ছবির উৎকর্ষতা নিয়ে ততটা নয়, সত্যজিৎ যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক অভিভাবক; একথা তার জীবৎকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তর্কটা তার ছবি আরো কতদূর যেতে পারতো, আরো কত কী বিষয় করতে পারতো, তা নিয়ে। শিল্প সমালোচনার এই ধারা বহু শিল্পীর পছন্দ হবার কথা নয়। সত্যজিতেরও হয়নি। সৃষ্টির ভেতর থেকে বিশ্লেষণ আসুক। মোটের ওপর সত্যজিতের প্রত্যাশা ছিল তাই। তাঁর ছবিতে মৃণাল সেনের শ্রেণি চেতনা নেই অথবা ঋত্বিকের দেখানো অসহনীয় বাস্তবতা, সত্যি কি এই অভিযোগে সত্যজিৎকে বোঝা সম্ভব!? নাকি প্রতিভাবান ঋত্বিক যখন বলেন 'ভারতবর্ষে ছবির মাধ্যমটিকে যদি কেউ বোঝেন তবে তিনি হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়' এই প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে কথা শুরু করা উচিত আমাদের। এক মহৎ শিল্পীকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা যেন হৃদয়কে মুক্ত রাখতে পারি।

একইসময়ে তিন প্রতিভাবান পরিচালক তিনটি পৃথক পথের যাত্রী হবেন এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলাতেও একই কথা খাটে। একই সময়ে এক দেশে এক জাতি এক ভাষার ক্ষেত্রে যদিও বা তুলনা চলে, সত্যজিতের ছবিতে বার্গম্যানের মতো ঈশ্বর মৃত্যু যৌনতার অভাব নিয়ে অভিযোগ হাস্যকর ঠেকে। বার্গম্যানের ছবিতে কেন সত্যজিতের জীবন দর্শন নেই, এও তেমনি হাস্যকর চাহিদা। সত্যজিৎ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আমাদের অনেক কিছু দেন, সে পাওয়া মহৎ পাওয়া, একথার স্বীকৃতি দিয়ে আরো পাওয়া, অতৃপ্তির কথা তোলা যায়, যেতে পারে।

মজা করে কিনা জানি না দেশে পাঠানো নিবন্ধে সত্যজিৎ যুক্তি দিয়েছিলেন, অনেকে মনে করেন 'পথের পাঁচালী'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি, যাকে সত্যজিৎ অতিক্রম করতে পারেননি। সমালোচনার প্রভাব পড়েছিল 'পথের পাঁচালী' বেরোনোর পর। কেননা ওটি ওঁর প্রথম ছবি। এই সূত্র ধরে সত্যজিতের প্রশ্ন 'তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— তাহলে কি সমালোচনার প্রভাব আমার শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি?' দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা, যা কেবল নিজের পাণ্ডিত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে, ছবির থেকে দূরে গিয়ে অনধিকার চর্চা করে; তার প্রতি সত্যজিৎ মোটেও সদয় ছিলেন না। ছবি ও দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধন সমালোচনার প্রধান কাজ হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

তবু সমালোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে সন্ন্যাসীর নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে কাজ করে যাওয়া শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। (কেউ কেউ আড়ালে রাখলেও সংবেদনশীলতা ছাড়া শিল্পী হতে পারে না।) রবীন্দ্রনাথও পারেননি। কল্লোল যুগের কালি ছোড়াছুড়ির মধ্যে তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন। সত্যজিতের পক্ষেও পুরোপুরি উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়েছিল। এই বাধ্যত জড়িয়ে পড়া, আমাদের বিবেচনায় ভালো ফল ফলিয়ে ছিল সাহিত্যে, ছবিতে। কল্লোল উত্তরকালে এক অন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন, সত্তর দশকের সময় থেকে অন্য সত্যজিৎ। এই দুই মহান স্রষ্টা নিজের নিজের পথে যে বদল আনলেন, তার জন্য সময়-এর সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদেরও কিছু মূল্য প্রাপ্য বৈকি! সত্যজিতের ছবিতে মানবতাবাদ নিয়ে কথা হয়েছে বেশি। মানবতার রকম ফের

খুঁজতে কখনো রবীন্দ্রনাথ কখনো আন্তন চেকভ-এর মতো মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তুলনা এসেছে। কারো কারো কাছে তাঁর ছবির মানবতা, নিছক ভাববাদী মানবতা! আমরা এই নিবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করছি না। বরং সমাজ দেশকালের প্রতি সত্যজিতের দায় নিয়ে যে কথাগুলো ওঠে, সেই অনুযোগগুলি যাচাই করতে চাইছি। দেখতে চাইছি যে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের ওপর তার ছবি, সাহিত্যের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি; সেই নাগরিক মধ্যবিত্ত তাঁর ছবিতে কীভাবে এলো, সত্যজিৎ এদের প্রতি ঠিক কী মনোভাব পোষণ করেন শেষাবধি!

দুই

সত্তরের দশকে এসে সত্যজিতের ছবিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা বয়ান উঠে আসতে থাকে। বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে হোঁচট খেয়ে পড়তে হচ্ছিল। একদিকে একটা চূড়ান্ত রেডিক্যালিজম অন্যদিকে ভয়ঙ্কর আপোস। বেঁচে থাকার জন্য লড়াই অথবা টিকে থাকার জন্য আপোস— এই ছিল তরুণ প্রজন্মের বিকল্প। সত্যজিতের কলকাতা ট্রিলজি বিষয় হিসেবে এই বাস্তবকে বেছে নেয়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০)-এর নায়ক সিদ্ধার্থ ব্যবস্থার ব্যভিচারকে চিনতে পারে, প্রতিবাদ করতে চায়, কিছু দূর এগিয়েও ফিরে আসে। 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১)-এর নায়ক শ্যামলেন্দু সাফল্য পেয়েও আরো সাফল্য, আরো ক্ষমতার ফাঁদে পড়ে চক্রান্তকারী মন্দ মানুষে রূপান্তরিত হয়। আর ১৯৭৫-এর 'জনঅরণ্য'-এ সোমনাথ একজন বিবেকবান মানুষ হয়েও জীবনের প্রয়োজনে এমন আপোসের পথে যায়, যেতে হয়; যা সে কল্পনা করেনি। খান তিনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর চূড়ান্ত মন্দা বেকারি ও বিবেকহীন তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রকে দেখে একটা বড়ো অংশের যুব সম্প্রদায় বুঝেছিল, ইংরেজ বিদায় হয়েছে বটে, কিন্তু মুশকিল আসান দূর অস্ত। গরিব ও মধ্যবিত্তের বহু অধিকার এখনও অপ্রাপ্ত। মৃত্যু উপত্যকার বাস্তবকে মেকি জাতীয়তাবাদ দিয়ে বেশি দিন ঢেকে রাখা যায় না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৮)-তে এই মধ্যবিত্ত যুবাদের একটা নৈতিকতার সঙ্কট আঁকা হয়েছিল প্রচ্ছন্নভাবে। যারা ছবিটিতে এসব খুঁজে পান না, তারা ছবিটির সবটুকু গ্রহণে অপারগ। খবরের কাগজ পোড়ানোর প্রতীকী নাগরিক মধ্যবিত্ততাকে ধ্বংস করার কৌতুককর ঘটনায় যার শুরু তা যেন নাগরিক যুবকদের অন্তর্গত আজন্ম লালিত শহুরে হাওয়া এসে নিভিয়ে দেয়। নইলে সেই চার যুবক যারা জঙ্গলে হারিয়ে যেতে এসেছিল, তারাই নগর সংস্কৃতির বাহক একটি পরিবারের সান্নিধ্যে এসে কী অবলীলায় শহুরে আদব কায়দা লজ্জা শরমের জগতে চলে যায়! সত্যজিৎ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর রোমান্টিক জগতকে ভাঙেন। ছবির ভাষাতেই। দেখান, এই জঙ্গলী মাতলামো, জনজাতির সান্নিধ্য, চার যুবকের বদ্ধমূল নাগরিক 'মধ্যবিত্ত বোধ'-কে টলাতে পারে না। এ কেবল উপরিতলের রোমান্টিসিজম। বোহেমিয়ানিজম এখানে বড়োজোর শৌখিন বাউণ্ডুলেপনা। অরণ্য তাদের ব্যাডমিন্টন, মেমরি গেম, মাও থেকে অতুল্য ঘোষ নিয়ে নাগরিক অর্থহীন কচকচানি থামিয়ে দিতে পারে না। মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে আলাদা হতে পারে না। সে এক অন্য বিপ্লবের গল্প। অরণ্যের কয়েকটি দিনরাত্রিতেও তা অধরা থেকে যায়।

এই একই সময়ে 'মহানগর' ছবিতে কলকাতার নিম্নবিত্ত পরিবারের নিখুঁত চিত্র পাই। অনেকের কাছে এ নিছক একটি নারী মুক্তির গল্প হলেও আমাদের বিশ্বাস এ ছবি তার থেকে অনেক বেশি কিছু। বাড়িতে মা, সঞ্চয়হীন রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার বাবা, অবিবাহিত বোন, স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান— সবাই নির্ভর করে নায়কের রোজগারের ক-টা মাত্র মাসকাবারি টাকার ওপর। স্ত্রী, যার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়, চাকরি করতে স্বামীর অনুমতি চান, বহু কষ্টে তা মিললেও স্কুল মাস্টার শ্বশুরমশাই তা মানতে পারেন না। অথচ অর্থাভাবে নিজেকে বৃদ্ধ অপাংক্তেয় অবহেলিত ভেবে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদের দোরে দোরে সাহায্য চান। ফলে এ কেবল ঘরের বউয়ের বাইরের জগতে পদার্পণ এর গল্প নয়। পূর্ব প্রজন্মের বাবা, এ প্রজন্মের স্বামীকে একটা কাঠঠোকরার সমানে ঠুকরে চলার গল্প। অথচ স্বামীর ব্যাঙ্ক ফেল করায় বউমা যখন একমাত্র রোজগেরে, শাশুড়ি মাছ না দিয়ে ভাত খাওয়াতে পারেন না বউমাকে। স্ত্রীকে চিনতে পারেন না স্বামী। শ্বশুরমশাই কথা বন্ধ করে দেন বউমার সঙ্গে। আর বউমা তার অফিস বান্ধবীর 'গিফটেড' লিপস্টিক মাঝে মাঝে অফিসে লাগিয়ে, বাড়ি ফেরার আগে মুছতে ভোলে না। এমন হাজারো ডিটেলিং সত্যজিৎ স্বভাবসিদ্ধ মুন্সিয়ানাতে যুক্ত করে দেন। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতেও চাকরিও যে শেষপর্যন্ত রাখা গেল না তার কারণ একটা 'অন্যায়'। সে অন্যায় অফিস কর্তৃপক্ষের। যদিও সরাসরি নায়িকার প্রতি নয়, বরং অন্যায় ছাঁটাই-এ নায়িকার কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব আর অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটতো, তবু সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করে। বিপন্ন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে এবার স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে চাকরির খোঁজে মহানগরের ভিড়ে মিশে যায়, ভীষণ যন্ত্রণার মাঝেও জীবনের জয়গান বেজে ওঠে।

'সীমাবদ্ধ'-তে নায়ক শ্যামলেন্দু (বরুণ চন্দ) ভালো ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল পিটার্স কোম্পানিতে। বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, দামি আসবাব, গাড়ি, স্ত্রীর পার্লার, রেসের মাঠ, বিলিতি ক্লাব, পার্টি থ্রো-এর চক্কর থেকে সে যেমন বেরোতে পারে না, তেমনি তার মনের আরামের কারণ হয় সম্ভ্রান্ত মনের শ্যালিকা

(শর্মিলা ঠাকুর), স্ত্রী বা তথাকথিত বিলিতি আদব কায়দা জানা অন্য কেউ নয়। সে প্রাণের আনন্দ খুঁজে পায় পাহাড়ের বোর্ডিং স্কুল থেকে পাঠানো ছোট্ট সন্তানের আদুরে চিঠিতে। এই দ্বৈততা তাতে ছিঁড়ে খায়। উন্নতির নেশা, ক্ষমতার নিশিডাক সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না বলেই রুচি শিক্ষা মেধা সৌন্দর্যের থেকে শ্যামলেন্দু দূরে সরে যায়। শ্যালিকার প্রত্যাখ্যান তারই প্রতীক হয়ে আসে।

'জনঅরণ্য'-এর নায়ক সোমনাথ (প্রদীপ) 'দালাল' শব্দটির চাপ নিতে পারেনি, সৎ সজ্জন যুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত পিতার সন্তান হিসেবে কষ্ট হবারই কথা। বাজারে সেদোলে বোঝা যায় দালালির মর্ম। বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবিকার সন্ধানে সেখানে গিয়ে পড়লো। বিশুদা রূপী উৎপল দত্ত অবশ্য ইংরেজি মিডলম্যান বলে কাজটা সোজা করে দিয়েছিলেন। বউদি (লিলি চক্রবর্তী) বলেছিলেন, নামটা যখন তুমি দাওনি, তাহলে এতো ভাবা কেন? ওর পরামর্শ ছিল, প্রায় 'সীমাবদ্ধ'-এর শ্যামলেন্দুর কায়দায় প্রতিষ্ঠিত দাদার (দীপঙ্কর) থেকে দালাল শব্দের একটা সংস্কৃত প্রতিশব্দ জেনে নেওয়ায়, কেননা তাতেই সব শুদ্ধ কিনা! বিদ্রুপ অন্যভাবে এসেছিল মি মিত্তির রূপী গ্রেট রবি ঘোষের কাছ থেকে। গোয়েঙ্কার অর্ডার পেলে একবছরের চিন্তা যায়, হোটেলের কক্ষে একটি মহিলা ভেট হিসেবে পাঠাতে হবে সেই গোয়েঙ্কাকে। গোয়েঙ্কা কে? গাড়িতে লিফট দিতে গিয়ে যিনি বলেছিলেন মদ তার চলে না, বাড়ি ফিরতে রাত করেন না! সোমনাথও রণে ভঙ্গ দিতে চায়। মহানগরের আরতি (মাধবী মুখোপাধ্যায়)-এর মতো প্রত্যাখ্যান করতে চায় এই নৈতিক আপোসকে। কিন্তু পারে না শেষপর্যন্ত। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত এজেন্ট মি মিত্তির বুঝিয়ে দেন এটাই বাস্তব, এটাই ভবিতব্য। নৈতিকতার কোডগুলো বদলে ফেলতে হবে। পাকাল মাছের মতো কাদা ধুয়ে ফেলতে হবে। নৈতিক টানাপোড়েনের মূল্য বাজার দেবে না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। তুমি বাতিল হয়ে যাবে। মি মিত্তির সোমনাথ ব্যানার্জিকে নিজের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দেন। মনে করিয়ে দেন সোমনাথের আয় অফিসের পিয়নের চেয়ে কম। বুঝিয়ে দেন, সোমনাথের লড়াই করে মরার দম নেই, গায়ে গতরে খেটে গ্রাসাচ্ছাদন করবার মুরোদ নেই। দাদার মতো কোম্পানির বড়ো অফিসার হওয়ার মতো রেজাল্ট নেই। সঞ্চয় বলতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূল্যবোধ, বাজারে যার মূল্য শূন্য। এই মরালিটি বাজারের নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক। তিন তিনটে জায়গায় সোমনাথ মি মিত্তির-এর সঙ্গে ভেটযোগ্য মেয়ে খোঁজে। সে এক আশ্চর্য যাত্রা। মাত্র একটা দিনের অভিজ্ঞতা। অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিচ্ছে জীবনের কঠিন বাস্তবতা। সে বাস্তবতা নিষ্ঠুর ও অসহনীয় হয়ে ওঠে যখন কণা ওঠে ট্যাক্সিতে। কণা, প্রিয় বন্ধু সুকুমারের বোন। সুকুমারের অসহায় পরিবারকে সে দেখেছে। কণা মেয়ে, কণা গ্র্যাজুয়েট নয়। তাই তাকে খানিক বেশি নামতে হয়। পাকাল মাছের মতো পাক না মেখে তার চলে না। অর্ডারটা পায় সোমনাথ। চিন্তিত আদর্শবাদী বাবা খুশি হন। ফল দেখে খুশি হবার সময় এটা। পথ বিচারের সময় নয়। সে রদ্দি মরা পুরনো মূল্যবোধ আজ বাতিল!

তিন

মৃত্যুর ঠিক আগের দুটি বছরে (১৯৯০-৯২) সত্যজিৎ তিনটি ছবি বানান। গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা এবং আগন্তুক। ১৯৮৪-তে 'ঘরে বাইরে'-এর শুটিং চলার মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'গণশত্রু'-এর সময়ও ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁর। তবু শেষ তিনটি ছবিতে নাগরিক মধ্যবিত্তকে আরো নতুন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করান। আমাদের সভ্যতা আধুনিকতা নিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলেন। আধুনিকতার পোশাক, সে কেবল পচাগলা বাস্তবতাকে ঢেকে রাখার জন্য, অনৈতিকতাকে সহনশীল করে তোলার জন্য। ছবি তিনটি এরকম কথাই ভাবিয়ে তোলে। চলচ্চিত্রের সত্যজিতিয় ভাষার তুলনায় 'গণশত্রু' বেশ দুর্বল বলে সিনেমা-ভাবুকরা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইবসেনের নাটকের ভারতীয়করণের কাজটি দুরন্ত করেছেন সত্যজিৎ। কাহিনি বুননের কিছু ফাঁক ফোকর নজরে এসেছে ঠিকই। কিন্তু সমাজ রাজনীতি ধর্ম কুসংস্কারের বিশ্রী ক্ষতিকর ককটেলের পুরোভাগে থেকেছে তথাকথিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত, এই মূল্যবান কথাটা সত্যজিৎ বের করে এনেছেন। এ পোড়া দেশ বিজ্ঞানকে কতগুলো যান্ত্রিক উন্নতিভাবে বড়োজোর। বিজ্ঞানবোধ, যুক্তিবোধ, ইতিহাস বোধের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো ধর্মীয় আবেগ, ধর্মীয় বিশ্বাস— সে যতই অন্ধ হোক না কেন! গ্যালিলিও পারেননি তথাকথিত মধ্যযুগে। আর 'গণশত্রু'-তে ডাক্তারবাবুও পারেননি। ১৯৯০-এর বিশ্বায়ন ঋদ্ধ আধুনিক সময়ে। সময় বদলেছে, তন্ত্র বদলেছে, কিন্তু ক্ষমতার ভাষা, ক্ষমতার আধিপত্য? সত্যজিৎ দেখান বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা মন কুসংস্কারে, অন্য মন প্রগতিতে। ক্ষমতাতন্ত্রের চুঁইয়ে পড়া ক্ষমতা চেটে বাঁচে মধ্যবিত্ত। যেকোনো বিদ্রোহ তার পক্ষে স্ববিরোধ। ডাক্তারবাবু আমাদের আদর্শ হয়েও, গভীর সঙ্কটে ডাক্তারবাবুরূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর চোখে মুখের ভয় উদ্‌বেগ আশঙ্কা টেনশন আমাদেরও গ্রাস করে। চাকুরি চলে যাওয়ার ভয়, অপমানিত হবার ভয়, সম্মান খোয়ানোর ভয়, হামলার ভয়, সরকারি চক্রান্তে ফেঁসে যাওয়ার ভয়! মধ্যবিত্ত হেরে যায়, হেরে চলে।

'আগন্তুক'-এ এসে দেখি সভ্য আধুনিক 'কালচার্ড' মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণতার গর্তে পড়ে কী নিদারুণভাবে হাস্যস্পদ আর নাস্তানাবুদ

হচ্ছে নিজের বিবেকের কাছে। কমফোর্ট জোনের বাইরের দুনিয়াটাকে সে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করতে পারে না আর। আগন্তুক সন্দেহজনক 'জালি দাদু' সন্দেহহীন 'ভালো দাদু' হয়ে গৃহের মায়া কাটিয়ে অনির্দিষ্ট সুদূরের আহ্বান, দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগের কালে নাতিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই কূপমণ্ডূক হওয়া যাবে না। মধ্যবিত্তের শ্রেণি বেষ্টনীর কূপমণ্ডূকতা মধ্যবিত্তের অভিশাপ। আলোকায়নের যে আধিপত্য যুক্তিবিজ্ঞান আধুনিকতার নামে সভ্য-অসভ্য-এর বাইনারি নির্মাণ করছিল, আগন্তুক রূপী মামা (উৎপল দত্ত) তাকে জোরালো প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আধুনিকতার গর্ব অহং দম্ভের বদলে এবার আমাদের জনজাতির জীবনযাত্রা থেকে শিখতে হবে। ভাঙতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভাজনের রাজনীতিকে। জীবন সায়াহ্নে সত্যজিতের হয়ে আগন্তুক ছবির মামা রূপী উৎপল আমাদের এই পরামর্শ দিয়ে যান।

চার

'শাখা প্রশাখা'-তে দুই প্রজন্মের কাছে নৈতিকতার দুটি পৃথক ধরণ তৈরি হয়ে গেছে। নৈতিকতা হাজারো ব্যাখ্যান ও অলিগলি খুঁজছে। চার ভাইয়ের তিন ভাই নৈতিকতার তিন ব্যাখ্যা দিয়েছে। মেজ ভাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নৈঃশব্দও একটা ব্যাখ্যা বটে। সুর সংগীতের সৌন্দর্যের জগত, তার নৈতিকতাকে সুন্দর করেছে। বড়ো ভাই হরিসাধন ও সেজো ভাই দীপঙ্করের নৈতিক অবস্থান চোরা গলির চোরা মাল। সে স্বীকৃতি দিয়েও, কে উনিশ কে বিশ, সে কূট তর্কে মেতেছে তারা। যদিও মোটের ওপর দুজনই স্বীকার করে নিয়েছেন, একালে সাকসেসফুল হতে গেলে নৈতিকতার ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়তে হবে। ছোটো ভাই রঞ্জিত মল্লিকের দ্বিধা যদি তাদেরও থাকতো, এমন গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রেসের মাঠের জীবন তারা পেতেন না। 'শাখা-প্রশাখা'-এর প্রথম দর্শনে পিতার প্রজন্মকে প্রশ্নহীন ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল বলে ভালো লাগেনি। কাঞ্চনজঙ্ঘাতে যেমন পূর্ব প্রজন্মের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'শাখা-প্রশাখা'-তে তাই নেই। কিন্তু শেষ দৃশ্যে নাতি যখন দাদুর কাছে এক নম্বরি, দু-নম্বরির সঙ্গে দাদুর কি তিন নম্বরি না চার নম্বরি জানতে চায়; তখন তা যেমন আর প্রশ্নহীন থাকে না। তেমনি নাতির কল্পনার মতো আমাদেরও ধোঁয়াশা থেকে যায় চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটের সফল বাঙালির নৈতিকতার চেহারা!

পরের পর ছবিতে সাফল্য-অসাফল্য, আধুনিকতা-অনাধুনিকতা, নগর সংস্কৃতি-গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে, কখনো পাশাপাশি রেখে পড়তে চান। যাকে খাঁটি বলে ধরে নিচ্ছি তা ঠিক কতটা খাঁটি কতটা ভাওতা সত্যজিৎ বুঝে নিতে চান। এবং এই পর্যায়ের ছবিগুলোতে সত্যজিৎ পক্ষ নিতে আর দ্বিধা করেন না। 'সীমাবদ্ধ'-তে শ্যামলেন্দুর সাফল্যের পাশে প্রায় কিছু নয় শর্মিলার পক্ষে থাকেন সত্যজিৎ। দেখনদারির বদলে জেতান রুচিকে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-এর শেষাংশ অনেকের মতে দিকভ্রান্ত মনে হলেও চাকরির খোঁজে পরাজিত নায়ক সিদ্ধার্থ বালুরঘাটে পৌঁছে সেই ছোটোবেলার পাখির ডাক ফিরে পায়। এক আপাত পরাজয় (কলকাতা ছেড়ে যাওয়া) বড়ো কিছুর আয়োজন (পাখির ডাক)-কে সূচিত করে। 'জন অরণ্য'-তে নায়ক এত বড়ো অর্ডারের সাফল্যেও মুষড়ে থাকে। 'আগন্তুক'-এ সন্দেহ সংশয়কে পুড়িয়ে ধূপের গন্ধ পাওয়া যায় মমতাশঙ্করের কান্নায়। 'শাখা-প্রশাখা'-য় বাবা স্বান্তনা খুঁজে পান 'অসফল' ছেলের কাছে। সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে সত্যজিতের ভাবনাও কম আগ্রহের বিষয় নয়। যারা শহুরে সফল তারা কেউই বামপন্থী নন। বস্তুত রাজনীতি নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়া যে সাফল্যের পথে বাধা, এইটুকু রাজনৈতিক জ্ঞান তাদের আছে। কোনো সাকসেসফুল মানুষের কাছে নৈতিকতার কোনো দৃঢ় শেকড় নেই। সেটি না কাটলে সাকসেস ধরা দেয় না। কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক দায়ও এদের নেই। এদের লক্ষ্য এক মুখিন। কৃত্রিম কতগুলো চিহ্ন এর দ্বারা এরা চিহ্নিত হতে চান। মায়া দয়া আবেগ অনুভূতি এসবে লাগাম না পরালে সাকসেস অধরা থেকে যায়। অন্যদিকে তথাকথিত অসফল 'সীমাবদ্ধ'-এর শর্মিলা, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র ধৃতিমান, 'শাখা-প্রশাখা'-এর প্রশান্ত, 'গণশত্রু'-র ডাক্তারবাবু, এবং তাঁর মেয়ে, থিয়েটার লিটল ম্যাগাজিন চালানো জামাই, 'আগন্তুক'-এর মামা— এদের পাশে এসে দাঁড়ান সত্যজিৎ। এই অসফলরাই ভবিষ্যৎ— এমন একটা নোট দেন। এতে তো বামপন্থীদের খুশি হবার কথা। 'হীরক রাজার দেশে' বা 'সদগতি'-এর কথা না হয় নাই তুললাম। একটা জরুরি পর্যবেক্ষণ দিয়ে লেখাটির ইতি টানা যাক। আমার উল্লেখ করা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে সত্যজিৎ তিনটি প্রজন্মকে নিয়ে আসেন বারবার। অন্তত দুটি প্রজন্ম। নায়ক, নায়কের পিতা, নায়কের সন্তান। 'মহানগর', 'আগন্তুক', 'শাখাপ্রশাখা'-এর কথা মনে করুন। একটা সত্যজিতের সময়, একটা তার আগের আর একটা তার পরের। পিতার নৈতিকতা খানিক ধোঁয়াশার মধ্যেও তুলনায় এগিয়ে ছিল। তার সময়ের নাগরিক মধ্যবিত্তের নৈতিকতার অবক্ষয় শুরু। আর এই যে 'আগন্তুক'-এর, 'শাখা-প্রশাখা'-এর বাচ্চারা বাবাদের নব্য নৈতিক (চরম সুবিধাবাদী) ভাষণ শুনতে শুনতে বড়ো হল; তারাই তো পরবর্তী সময়ে দ্বিধাহীন অনৈতিক হল। এ প্রজন্মের অনৈতিকতা, দ্বিধাহীন। সে কথা বাংলা ছবিতে কে দেখাবে? তিনি যেই হোন তাঁকে তাঁর নিজের নৈতিক অবস্থানকে ভাসমান করলে চলবে না। তেমন কাউকে কি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট করে?

লেবাননের চিত্রশিল্পী ও গল্পকার খলিল জিবরান

কামরুজ্জামান

কেউ বলেন কাহলিল জিবরান, কেউ বলেন খলিল জিবরান। প্রকৃতপক্ষে খলিলই ঠিক। কেননা, এটি আরবি উচ্চারণ। ইংরেজি থেকে অনেকে তাঁর লেখা অনুবাদ করেন বলে কাহলিল লেখেন। খলিল (আরবি) অর্থ বন্ধু। জিবরান ঈসায়ী দেবতা। অর্থাৎ খলিল জিবরান শব্দের অর্থ হল দেবতার বন্ধু।

জিবরান লেবাননের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ওয়াদি কাদিশা উপত্যকা অঞ্চলের বিশারি গ্রামে ১৮৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য ইসলামি বিশ্বকোষে জিবরানের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৮৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি অথবা ৬ ডিসেম্বর। আর বিশারিতেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

জিবরানের পিতার নাম খলিল, মাতা কামিলা রাহমি। জিবরানের পিতা তাঁর মাতার দ্বিতীয় স্বামী। কামিলা তাঁর প্রথম স্বামী ও পুত্র পিটার-সহ অনেকদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বসবাস করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কামিলা দেশে ফিরে পিতা স্টিফের রাহমির সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। তারপর একসময় খলিলের (জিবরানের পিতা) সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের প্রথম সন্তান জিবরান। সুলতানা ও মারিয়ানা নামে জিবরানের আপন দুই বোন ছিল।

জিবরানের জন্মভূমি বিশারি গ্রাম নয়নাভিরাম। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা থাকলেও পার্থিব ঐশ্বর্যে কোনোভাবে সমৃদ্ধ ছিল না। তাই সেখানকার অধিবাসীদের জীবন যাপন খুব একটা স্বচ্ছল ছিল না। খলিল পরিবারও ছিল আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পীড়িত। দারিদ্র্যের তাড়না থেকে মুক্তি পাবার অভিলাষে ১৮95 সালে খলিল পরিবার সাত-সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর আমেরিকায় চলে যান। জিবরানের বয়স তখন বারো বছর। বোস্টনের এক দরিদ্র এলাকা চায়নাটাউন। সেই দরিদ্র এলাকাতেই বসবাস শুরু করলেন। এখানেই তাঁর হাই স্কুলে অধ্যায়ন শুরু।

১৮৯৮ সালের ৩ আগস্ট জিবরান লেবাননের রাজধানী বৈরুত (বেরুট!) শহরে ফিরে আসেন। সেই সময় আরবি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। বৈরুতের ডিলা সাগিস কলেজে তিন বছর কাটান। আর এই তিন বছরে তাঁর আরবি ভাষা-জ্ঞানের অভাব অনেকটাই পূরণ হয়। ১৯০২ সালে তিনি লেবানন ত্যাগ করে প্যারিস এবং সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে নিউইয়র্ক যান। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে জিবরান যখন বোস্টনে অবস্থান করছিলেন সে সময় এক দুর্ঘটনায় তাঁর বোন মারিয়ানা বাদে পরিবারের সবাই মৃত্যুবরণ করেন।

১৯০৪ সালে জিবরানের বয়স যখন একুশ বছর, তখন তিনি কুড়িটির বেশি চিত্রকর্ম আঁকেন এবং সেগুলো প্রদর্শনীর ইচ্ছায় কুড়ি ডলার ধার করেন। কিন্তু কোথাও সুবিধামতো কোনো স্টুডিয়ো পেলেন না। অবশেষে বোস্টনের এক ভাবুক ও স্বাধীনচেতা আলোকচিত্রশিল্পী জিবরানের চিত্র প্রদর্শনীর জন্য তাঁর স্টুডিয়ো উন্মুক্ত করে দিলেন। প্রদর্শনীতে বিরাট লোকের সমাগম হল। কেউ প্রশংসা করলেন, কেউ সমালোচনা করলেন, কেউ-বা বিদ্রূপভরে হাসলেন। কেউই কোনো ছবির দাম জিজ্ঞেস করলেন না বা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। অথচ দরিদ্র পীড়িত সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আনতে বা ধার শোধ করতে যুবক চিত্রশিল্পীর জন্য এটা খুব জরুরি ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। কয়েকদিনের মধ্যে প্রদর্শনীর স্টুডিয়োতে আগুন লেগে সব ছাই হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জিবরানের সমস্ত শিল্পকর্মও।

প্রথম চিত্র প্রদর্শনী দরিদ্র শিল্পীকে দরিদ্রতর পর্যায়ে নিয়ে গেল। আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান না হলেও প্রদর্শনী থেকে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা তাঁর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ প্রশস্ততর করে এবং তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান স্টুডিয়োর এক কোণে বসে থাকা সংকুচিত শিল্পী লক্ষ্য করলেন, এক সুন্দরী মহিলা গভীর মনোনিবেশ সহকারে ছবিগুলো দেখছেন। জিবরান এগিয়ে এসে ছবিগুলোর উপমা, প্রতীক এবং প্রতিপাদ্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন। উভয়ের উভয়কে ভালো লাগল। তাঁদের এই পরিচয় অনন্য সাধারণ বন্ধুত্বে পূর্ণতা লাভ করল। এই সুন্দরী মহিলা হলেন মেরী এলিজাবেথ হ্যাসকেল। জীবনীকার মার্টিন এল উলফ লিখেছেন— ‘Her self

contained soul proved to be a spiritual and moral refuge and anchor for Gibran'. মার্কিন কবি বারবারা ইয়ং (১৯২৫ সাল পর্যন্ত জিবরানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন) বলেছেন— 'যেকোনো লেখা মেরী এলিজাবেথ হ্যাসকেলকে না দেখিয়ে প্রেসে দিতেন না জিবরান।'

চিত্র প্রদর্শনীতে ব্যর্থ হয়ে জিবরান আরবি 'আল্-মুত্তহাজির' পত্রিকার সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ শুরু করেন। একই সঙ্গে তিনি এলিজাবেথের মানব সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। আরবিতে গল্প, কবিতা লেখা শুরু করলেন। আবার এলিজাবেথের উৎসাহে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। জিবরান তাঁর বহু লেখায় বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে ছোটো-ছোটো বর্ণনামূলক আখ্যান ব্যবহার করলেন। কিন্তু এ সব ছিল মূলত নীতিকথামূলক আখ্যানের প্রতিস্থাপন। শিক্ষামূলক রচনা, প্রবচন, প্রতীকাশ্রয়ী কাহিনি ও শ্লেষমূলক কৌতুক— সবই জিবরানের রচনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। তবে আরবি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত শৈলী রচনাকে দিয়েছে মনোমুগ্ধকর চমৎকারিত্ব। জিবরান ভালোবাসা সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন— 'ভালোবাসা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো শব্দের দরকার হয় না। কারণ ভালোবাসা হল, একটা অচঞ্চল প্রার্থনা সংগীত, যা রাতের নীরবতার ভেতরে শোনা যায় এবং সেখানে ধোঁয়াশা ও সব কিছুর জন্য রয়েছে নির্যাস।'

জিবরানকে চিত্রশিল্পে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এলিজাবেথ নিজ খরচে প্যারিসে পাঠান। জিবরান ১৯০৮-১০, এই সময় 'অ্যাকাডেমিক জুলিয়ান' প্রখ্যাত শিল্পাচার্য ও ভাস্কর অগাস্ত রঁদার তত্ত্বাবধানে চিত্রশিল্পে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ইসলামি বিশ্বকোষ সূত্রে জানা যায়, জিবরান রডিন-র ছাত্র ছিলেন। প্যারিসে থাকাকালীন তাঁর হৃদয়ে বিচিত্রতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উন্মেষ ঘটেছিল। বস্তুত জিবরানের চিত্রশিল্পের গতিময় বিকাশ প্যারিসেই স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি পেয়েছিল। তাঁর বিদ্রোহী বিবেকের বিকাশ ও প্রকাশে চিত্রশিল্প ছিল তাঁর অন্যতম মাধ্যম। এক সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন, 'তুলি ছিল তাঁর বল্লম, কলম ছিল তাঁর তরবারি। 'সং অফ ইনোসেন্স' কাব্যগ্রন্থের কবি ও 'স্প্রিচ্যুয়াল ড্রয়িংস' ছবির শিল্পী ইউলিয়াম ব্লেকের প্রতিভার সঙ্গে জিবরানের সাযুজ্যতা ও সমতা লক্ষ করে ফরাসি মনীষী আঁরি দ্য বোফর্ত জিবরানকে বিশ শতকের 'উইলিয়াম ব্লেক' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯১২ সালে প্যারিসে আরব রাজনৈতিক সম্মেলনের পর তিনি বোস্টনে ফিরে যান এবং 'আল-হালাকা আয-যাহরিয়া' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯১৩ সালে তিনি নিউইয়র্ক যান এবং অ্যারিয়া-এর সঙ্গে আসসাহই-এর স্থলাভিষিক্ত 'আল-ফুনুন' নামে আরবি সাময়িকীর সম্পাদনা করেন। তিনি আমেরিকায় সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের জন্য পথ তৈরির চেষ্টায় অবতীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে নিজেই 'দি সেভেন আর্টস' নামে একটি সাময়িকীর সূচনা করেন। আর এই সময়ই তিন-তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

১৯১৮ সালে জিবরানের দর্শনমূলক কবিতা 'আল-মাওয়াকিব' এবং তাঁর প্রথম ইংরেজি সাহিত্যকর্ম 'The Madman' প্রকাশ করেন। এই সময়ই তিনি 'আল-আওয়াসিফ' এবং 'আল-বাদাই ওয়াত-তারাইফ' আরবি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে জিবরানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'আল রাবিতাতে আল-কালিমিয়া' (Pen Club) নামক সাহিত্য সংঘ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সাহিত্য সংঘ সমসাময়িক আরবি সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও এই সময় থেকে তাঁর আরবি গ্রন্থের প্রকাশ কমতে থাকে। বাড়তে থাকে ইংরেজি চর্চা। ১৯১৮-২৮। এই দশ বছর আরবি নয়, ইংরেজি বই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে—

1. The Madman (1918)
2. Twenty Drawings (1919)
3. The Forerunner (1920)
4. The Prophet (1923)
5. Sand and Foam (1926)
6. Tears and Laughter (1927)
7. Jesue, the son of man (1928)

'দি প্রফেট' (আন-নবী) গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সারা পৃথিবীর কবিতা পাঠকের কাছে পরিচিত। তাঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভৌগোলিক বিচরণের ক্ষেত্রে সময়হীনতা এবং মরমী দার্শনিকের এক অবাস্তব জগৎ। আরবি, ইংরেজি উভয় রচনাতেই তাঁর অদ্ভুত শৈলী তাঁর রচনাকে দিয়েছে মনোমুগ্ধকর স্বাতন্ত্র্যতা।

নিউইয়র্ক শহরের হাসপাতালে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩১ সালের ১০ এপ্রিল, মারা যান। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবন। তাঁর মৃত্যুর পর আরবিতে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি বই—

১. আরায়েস আলমুরুজ— উপত্যকার মৎস্যকন্যা
২. দামাহওয়াইবতিসামাহ— হাসি ও অশ্রু
৩. আল আরওয়াহ আলমুতামারিদা— বিদ্রোহী বিবেক
৪. আল আজনিহা আল মুতাকাসিরাহ— ভাঙা পাখা
৫. আল মাওয়াকিব— মিছিল

জিবরানের মৃত্যুর পর তাঁর শুভানুধ্যায়ী এলিজাবেথ ও তাঁর ছোটো বোন মারিয়ানা যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জিবরানের মৃত্যুর পর এই দুজনের উদ্যোগে

আরবির পাশাপাশি প্রায় বারোটি ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছে—

1. The wanderer (1932)
2. The Garden of the Prophet (1933)
3. Prose & Poems (1934)
4. Secrets of the Heart (1947)
5. Nymphs of the valley (1948)
6. Spirits Rebellious (1949)
7. A Tear and a Smile (1950)
8. Processions (1958)
9. The Broken winds (1959)
10. The voice of the Master (1960)
11. Thoughts and Meditations (1961)
12. Spiritual Sayings (1963)

কাজের খাতিরে জিবরান জীবনের বেশিরভাগ (দুই তৃতীয়াংশ) সময় প্রবাসে কাটিয়েছেন। কিন্তু ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখার দিনগুলো ভুলতে পারেননি। তাঁর পত্রাবলিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য গভীর আকুলতা এবং তিনি যা বর্ণনা করতে পারেননি সেই 'Winged Words'-এর জন্য অবর্ণিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

সুদূর আমেরিকায় প্রবাসজীবন যাপন করলেও জিবরান তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে ভুলতে পারেননি। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোটো গ্রাম বিশারি তাঁর সমগ্র উপলব্ধিতে চিরজাগরুক ছিল। দেশের জন্য তাঁর মন কেঁদে উঠত, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। তাই তিনি দেশে ফিরলেন মহাপ্রয়াণের পর। যে বৈরুতের সমাজশাসকেরা তাঁর চিন্তা-ভাবনা (বই!) পুড়িয়ে দিয়েছিল, অনুপস্থিতিতেই তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল; তাঁর মরদেহ বহনকারী জাহাজ বন্দরে ভিড়লে, সারা লেবাননের জনগণ যেন বন্দরে ভেঙে পড়ল। মালায়-মালায় ছয়লাপ হয়ে গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হৃদয়ের শেষ উচ্ছ্বাস ও উষ্ণতা দিয়ে তাঁকে বরণ করলেন। লেবানন তার প্রিয় পুত্রকে বীরোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল। ছোটো বোন মারিয়ানা বিশারি গ্রামের 'মার সারকিস গির্জা'-টি কিনে নিলেন। জিবরানের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে সেখানে সমাহিত করা হল। তিনি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হলেন।

জিবরান সাহিত্য, শিল্পের চর্চায় সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অসহনীয় দুঃখ-দৈন্য দুর্দশা তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, বিশ্ব-সাহিত্যে 'জিব্রানিজম' নামে এক অনন্য রচনাশৈলীর উদ্ভব। তাঁর সাহিত্য-বৈভব যুগে যুগে মানুষকে সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গেছে এবং নিয়ে যাচ্ছে।

খলিল জিবরানের হাফ ডজন অণুগল্প পাঠকদের জন্য উপহার।

গির্জার সিঁড়িতে: গতকাল, গির্জার মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে দেখি, দুই পুরুষ মাঝে একজন মহিলা বসে আছে। মহিলার চেহারার একপাশ ছিল বিমর্ষ, অন্য পাশটা দেখাচ্ছিল লজায় রক্তিম।

শয়তান ও দেবদূত: গতরাতে আমি এক নতুন ধরনের মজা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। আমার বাসার দিকে ধাবমান এক দেবদূত ও এক শয়তানের উপর তা প্রয়োগ করলাম। দরজার কাছে এসে দুজনে মিলিত হল। আমাদের উপর তারা পরস্পর হাতাহাতিতে লিপ্ত হল। কিছুক্ষণ পর একজন আরেকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, 'আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করছি এই কাজটা করে।' আরেকজন বলল, 'না, আমরা নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করছি।'

ছায়া: জুনের একদিন। ঘাস এলম গাছের ছায়াকে বলল, 'তুমি প্রায় সময় ডানে-বামে স্থান পরিবর্তন করো। ফলে তুমি আমার অসুবিধা সৃষ্টি করছ।' শুনে ছায়া উত্তরে জানাল, 'না, আমি নই। আকাশের দিকে তাকাও। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানের গাছটি বাতাসের কারণে একবার পশ্চিমে, আরেকবার পূর্বদিকে স্থান পরিবর্তন করে।'

প্রথমবারের মতো ঘাস উপরের গাছটির দিকে তাকিয়ে আর্তস্বরে বলল, 'হায়! দেখো, আমার চেয়েও এটি বড়ো ঘাস।'

বজ্রের আঘাত: শহরের এক প্রধান গির্জায় একজন ধর্মযাজক থাকতেন। এক দুর্যোগময় দিনে একজন অ-খ্রিস্টান মহিলা ধর্মযাজকের কাছে এসে বিনীতভাবে বলল, 'আমি একজন অ-খ্রিস্টান। এই ভয়াবহ দুর্যোগ হতে রক্ষার জন্য আমাকে কি এখানে আশ্রয় দেবেন'?

ধর্মযাজক মহিলাটির দিকে তাকালেন। তার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, 'না! এখানে শুধুমাত্র ব্যাপ্টিস্টরাই আশ্রয় পাবে, যারা পবিত্র পাণি গ্রহণ করে পূর্ণতা অর্জন করেছে।'

একথা বলা মাত্র আকাশ হতে ভয়ংকর বজ্রপাত হল গির্জার উপর এবং চারদিক ঘিরে ফেলল আগুনে। শহরের লোকজন ছুটে এল এবং মহিলাটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল। কিন্তু ধর্মযাজককে আগুন চারদিক হতে গ্রাস করে নিল।

প্রেমের গান: একদিন এক কবি একটা প্রেমের গান লিখেছিল এবং তা ছিল শ্রুতিমধুর। কবি এই গানটির অনেক অনুলিপি করে তার বন্ধু-বান্ধবী এবং পরিচিত নারী-পুরুষের কাছে পাঠাল। এমনকী দূর পাহাড়বাসী এক তরুণীর কাছেও পাঠাল, যার সঙ্গে কবির শুধু একবারই দেখা হয়েছিল।

একদিন তরুণী সেই পত্রবাহকের মাধ্যমে কবির কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তরুণীটি লিখল, 'তুমি আমার মনে

আশা জাগিয়েছ। তোমার পাঠানো প্রেমের গানটি আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি। এবার তুমি বাড়িতে এসো। আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করো। আশা করছি, আমরা আমাদের বাগদানের ব্যবস্থা করতে পারব।

উত্তরে কবি তরুণীকে জানাল, 'বন্ধু! একজন কবির অন্তরের ভালোবাসার গান ছিল সেটা। যে গান প্রতিটি নারী-পুরুষ গাইছে।'

তরুণীটি আবার কবিকে চিঠিতে লিখল, 'তোমার লেখাগুলো সব ভণ্ড আর মিথ্যায় ভরা। আজ হতে, এমনকী আমৃত্যু আমি তোমার মতো সব কবিকে ঘৃণা করে যাব।'

উচ্চাকাঙ্ক্ষা: একদিন এক সরাইখানায় তিনজন বন্ধু মিলিত হল। তাদের মধ্যে একজন ছিল তাঁতি, আরেকজন কাঠমিস্ত্রি এবং অন্যজন কৃষক।

তাঁতি বলল, 'আমি আজ চমৎকার রেশম কাপড়ের তৈরি একটা শবাচ্ছাদন বস্ত্র বিক্রি করেছি এবং দুই স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করেছি, আমাদের সবার জন্য মদিরা চাই।'

কাঠমিস্ত্রী বলল, 'আমি বিক্রি করেছি একটি কফিনের বাক্স। মদিরার সঙ্গে একটা বড়ো আকারের মাংস ভাজাও চাই।'

কৃষক বলল, 'আমি কেবল মাটি খুঁড়েছি। আমার মনিব আমাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়েছে। সুস্বাদু কেকের কথাও বলল এর সঙ্গে।'

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সরাইখানা জমজমাট। তারা প্রায়-সময়ই মদিরা, মাংস আর কেকের নির্দেশ করত এবং স্ফূর্তিতে মেতে উঠত। সরাইখানার কর্তা তার হাত মুছে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। কারণ তার খদ্দেররা স্বচ্ছন্দে বেশ মোটা টাকা ব্যয় করছে। অবশেষে তিন বন্ধু যখন সরাইখানা থেকে বের হল, তখন চাঁদ ছিল মধ্য গগনে। তারা নির্জন রাস্তায় গান করতে করতে হাঁটছিল এবং চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করছিল।

সরাইখানার কর্তা ও কর্ত্রী দরজায় এসে দাঁড়াল। তাদের দিকে তাকিয়ে কর্ত্রী বলল, 'দেখছ এই ভদ্রলোকগুলোর কাণ্ড। কেমন বেহিসেবি ও উচ্ছৃঙ্খল। আমাদের সন্তানকে কিন্তু এই সরাইখানার পরিচালক হিসেবে গড়ে তুলব না। শক্ত কাজও করতে দেব না। তাকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করব এবং একজন ধর্মযাজক হিসেবে গড়ে তুলব।'

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

ভাষার মৃত্যুঘণ্টার ধ্বনি

গৌতম গুহ রায়

'একটা ভাষা যদি তার পরিচয় থেকে বাদ চলে যায় তা হলে কী ক্ষতি হয় মানুষের? একজন বাঙালি যদি সারাটা দিন কোনো বাংলা অক্ষর না লিখে, না দেখে, না শুনে কাটিয়ে দিতে পারেন— কী ক্ষতি হয় তাঁর?

এমন কোনো ক্ষতি হয় না, যা দেখা যায়।

"এমন কোনো ক্ষতি হয় না, যা দেখা যায়—"

মেফিস্টোফেলাস এই কথা বলেই ফাউস্টের আত্মাটা নিয়ে নিয়েছিল।'

এই কথাগুলো দেবেশ রায় লিখেছেন 'দ্যোতনা'র ভাষা আলোচনায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যেটি বাস্তবিক সত্য, একজন বাংলাভাষী মানুষ যদি সারাদিনের শেষে হিসাব করেন, তিনি সেই দিনটিতে সারা দিনে একটিও অক্ষর বাংলায় লিখেছেন কি না; দেখবেন, লেখেননি, সারাদিনে একটিও বাংলা হরফ লেখেননি, কিন্তু পাতার পর পাতা লিখেছেন।

আবার অনেকেই আছেন যিনি দিনে একটিও বাংলা অক্ষর লিখেননি, পড়েনওনি। কারণ তিনি যে কাজ করেন, আদালতে, সরকারি দপ্তরে, সর্বত্র ইংরাজিতে লেখেন, পড়েন, সই করেন। নব্য শিক্ষিতদের অনেকেই তাঁর উত্তর প্রজন্ম যাতে ইংরাজিতে পটু হয় তাই বাসায় বাংলা কথা বলা পরিহার করার নির্দেশ জারি করেছেন। বাংলার 'গৃহস্থ' ব্যবহার সেখানে কাজের মেয়ে বা বৃদ্ধ বাবা মা ঠাকুমায় আটকে আছে, আগামী একদিন তাও ভোকাট্টা হয়ে যাবে। তবে মাতৃভাষায় কী তেমন প্রয়োজন? 'আগে আমার ধারণা ছিলো, মাতৃভাষা ছাড়া বুঝি প্রেমের কথা বলা যাবে না। রাস্তাঘাটে বাসে-ট্রামে চলাফেরা করতে করতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ঘুরতে-ঘুরতে সে ভুল আমার বহুদিন ভেঙ্গে গেছে। আগে ধারণা ছিল, মাতৃভাষা ছাড়া বুঝি মৃত্যুতে চোখের জল ফেলা যায় না। সে ভুলও আমার ভেঙ্গে গেছে।' (দেবেশ রায়/আত্মাহীন, মাতৃভাষাহীন)

গোটা বিশ্বেই আজ সবচেয়ে বড়ো আতঙ্ক এই মেফিস্টোফেলিসের রক্তবীজেরা। মানুষকে আত্মাহীন, চেতনাহীন, দেশহীন করার বিশ্বব্যাপী যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে শুধু সে শেকড়চ্যুত হচ্ছে তাই নয় হারিয়ে যাচ্ছে তার 'মাতৃভাষা'টাও। মাতৃভাষা বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বিবর্জিত শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়ে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুদের অবস্থা শেকড়চ্যুত গাছের মতো। এই প্রবণতায় বিপন্ন হচ্ছে তার মাতৃভাষা, লুপ্ত হচ্ছে তার জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি।

মাতৃভাষার অধিকার মানুষের জন্মগত। সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ও বাহন হচ্ছে মানুষের ভাষা, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় ও অধিকার। এখানেই আঘাত হানা হচ্ছে, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের এক মুখ্য এজেন্ডা এটি। কিছুদিন আগে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যাচ্ছে যে, আগামী একশো বছরে প্রায় ৩০০০ ভাষা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। গত শতাব্দীর শেষ পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিক্স'-এর এক সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বে তখন ৫১টি ভাষা ছিল যার সর্বশেষ মাত্র একজন জীবিত, লুপ্ত হয়েছে। একশো জনের কম লোক জানেন এমন ভাষা আছে প্রায় ৫০০টি। এক হাজার জন বলতে পারেন এমন ভাষার সংখ্যা এখন ১৫০০। ১০,০০০ জনের কম সংখ্যক মানুষ কথা বলতে পারে এমন ভাষার সংখ্যা এখন ৩,০০০টির মতো। বিশ্বের ৯৬ শতাংশ ভাষা বলেন মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে নেওয়া সমীক্ষার উপর প্রকাশিত জাতিসংঘের বিপন্ন ভাষার মানচিত্রে (Atlas of Endangered Language) ১৯৯টি অতি বিপন্ন ভাষার পরিচিতি প্রকাশ করেছিল। সে সব ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা একশোর কম। এর মধ্যে আবার বিপন্নতম ভাষার সংখ্যা ১৮ (এই সমীক্ষার পর এদের দুটি ভাষাজন প্রয়াত হয়ে ভাষাটি জনলুপ্তির হিসাবে লুপ্ত হয়েছে।) এই হিসাব দেখাচ্ছে এক দশকেই কতটা ক্ষয় হয়েছে ভাষাজনের সংখ্যায়। এই ১৮টি ভাষার প্রত্যেকটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা একজন করে। এই ভাষাগুলো হল, আপাইওকা (ব্রাজিল), বিকিয়া (ক্যামেরুন), চানা (আর্জেন্টিনা), ডাম্পাল (ইন্দোনেশিয়া), দিয়াহই (ব্রাজিল), কাইজানা (ব্রাজিল, সম্প্রতি মারা গেছেন), লাওয়া (পাপুয়া নিউগিনি), প্যাটুইন

(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), পাজেহ (তাইয়য়ান), পেমোনো (ভেনেজুয়ালা), তাজে (ইন্দোনেশিয়া), তাওশিরো (পেরু), তিনিগুয়া (কম্বোডিয়া), তলোয়া (ক্যালির্ফোনিয়া), ভোলো (অস্ট্রেলিয়া), উইনতু-নোমলাকি (ক্যালিফোর্নিয়া) ইয়াখান (চিলি), ইয়ারভি (পাপুয়া নিউগিনি)। এই উল্লেখিত ১৮টি ভাষার অনেকগুলো ইতিমধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের বঙ্গোপসাগরস্থিত দ্বীপ আন্দামানের বো ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা আজ শূন্য। তিন দশক ধরে একাই প্রতিনিধিত্ব করে ৮৫ বছর বয়সে সিনিয়ার বো ভাষা ব্যবহারকারিণী মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয় ভাষাটি। আলাস্কার মেরু অঞ্চলের ইয়ক ভাষার শেষ প্রতিনিধি মেরি স্মিথ ১৮ জানুয়ারি ২০০৮-এ প্রয়াত হন, ভাষাটিও লুপ্ত হয়। একটি ভাষার মৃত্যু মানে অভিধান থেকে তার অবলুপ্তি মাত্র নয়, সেই ভাষাটির মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা একটি সমাজের সংস্কৃতির ইতিহাস এবং স্মাজের আহরিত মূল্যবান জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় এর সঙ্গে সঙ্গে।

এঙ্গুলি ওয়া থিয়ংগ ও আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে ‘ভাষা যেহেতু যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, সুতরাং ভাষার মাধ্যমেই মানুষের কল্পনাকে উপনিবেশে নিয়ে আসা সবচেয়ে সহজ। আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাকে গোড়াতেই এমনভাবে লুট ও বিস্মৃত করা হয়েছে যে আফ্রিকাবাসীদের এখন ভাব প্রকাশের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় ইংরাজি, ফরাসি বা পর্তুগিজ ভাষার দিকে। বলা যায় আফ্রিকার উপর ইউরোপের ভাষা আধিপত্য সম্পূর্ণ হয়েছে’। এ শুধু আফ্রিকার ক্ষেত্রেই ঘটেছে তাই নয়, গোটা ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এর উদাহরণ। আমাদের দেশেও আমাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ তবুও ঔপনিবেশিক শাসক তার ভাষার আদলে গড়ে নিয়েছে আমার ভাষা-সংস্কৃতিকেও। আমাদের লোকনাটক, লোককথা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা শাসনকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ভাষাকে নিয়ন্ত্রণমুঠিতে নিয়ে আসতে চায়, ভাষার মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে পরাধীন করার ফলে শেকড়ের মানুষ তার নিজস্ব মনন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে তার কল্পনা ক্রমশ ইংরেজি, ফরাসি বা স্প্যানিস, পর্তুগিজ ভাষা প্রকোষ্ঠে বন্দি হয়ে যায়। ‘পাশ্চাত্য বা ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে এশিয়া-আফ্রিকার গত চারশো বছরের দ্বন্দ্বের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে আছে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে কল্পনা ও আত্মানুভূতির চরম বিকৃতি, যা এশিয়া আফ্রিকার সমস্ত উৎপাদন, বন্টন ও সম্পদের ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘটাতে পেরেছ ওরা’। ভারতের ভাষা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু। তিনি লিখেছিলেন যে ভাষা-কেবলমাত্র একটি উপায় বা বাহন রূপে দেখাবারও অপচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, যে-কোনো ভাষা দিয়েই, অর্থাৎ পরভাষার সাহায্যেও আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম নির্বাহ হতে পারে। তাঁর প্রতিবাদের মূল জায়গাটা এখানেই, পরভাষা দিয়ে সমস্ত কাজ সাধিত হলেও, সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়, কবিতায়, গানে, সৃজনে মাতৃভাষা আবশ্যিক। শাসকের ভাষা অনেক সময়ই জন-এর ভাষা হয়নি, মানুষ তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে মাতৃভাষাতেই। যেমন ল্যাটিন ভাষা নিয়ন্ত্রণের যুগে ইটালিতে অভেলিতের মুখের ভাষায় ‘ডিভাইন কমেডি’ রচিত হয়েছে। উনিশ শতকে ফরাসি ভাষা কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে রুশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও মোগল আমলে ফারসি, কিংবা ব্রিটিশ ভাষা কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে রুশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও মোগল আমলের ফারসি, কিংবা ব্রিটিশ আমলে ইংরাজি শাসকের অনুগ্রহের ছাতার তলে থাকলেও বাইরে থাকা বাংলায়, তামিল তেলেগু বা লোকভাষায় সাহিত্য ও কথা রচিত হয়েছে। কিন্তু আজকের সময়ে গ্লোবালাইজেশানের কালে ভাষার বিপন্নতা ক্রমশ বাড়ছে। কাজের ভাষা না হলে বিলুপ্তির অবধারিত খাদে গড়িয়ে পড়বেই বিপন্ন ছোটো ছোটো ভাষাগুলো।

উদাহরণ হিসাবে আমরা উত্তরের হিমালয় সন্নিহিত বাংলার দিকে তাকাতে পারি। হিমালয় সন্নিহিত বাংলায় এই ভাষা বিপন্নতার চেহারাটা এই সামগ্রিক চিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। Anthropological Survey of India’র তথ্যানুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশে ৩২৫টি ভাষাগোষ্ঠী ১২টি পৃথক ভাষা পরিবারে বিভক্ত, যাদের নিয়ে আবার তৈরি হয়েছে বৃহৎ ভাষা-পরিবার। ভারতীয় উপমহাদেশে চারটি বৃহৎ ভাষা পরিবার রয়েছে, ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রিক ও ভোট-চিনীয়। এই চারটি ভাষাগোষ্ঠীরই উপস্থিতি রয়েছে হিমালয় সন্নিহিত এই বাংলায়। আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৯(২) এবং ৩৫০ (ক) ও (খ) ধারায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভাষা মূলত আদিবাসীদের সমাজের মাতৃভাষাগুলোকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ভিত্তি যে মৌলিক অধিকার সেখানে ২৯নং ধারায় লেখা আছে, 'Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same'। কিন্তু বাস্তবের চেহারাটা অনেকটাই ভিন্ন। ভারতবর্ষে কোনো নির্দিষ্ট ভাষানীতি নেই বা ‘ভারতের ভাষানীতি’ বলে কোনো দস্তাবেজ তৈরি হয়নি। ১৯৯২-তে আমরা যে সংশোধিত শিক্ষা নীতি পাই সেখানে উল্লেখ আছে যে অল্প-সংখ্যক গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর এবং নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের বিশেষ অধিকার

থাকবে। হিমালয় সন্নিহিত বাংলায় চিত্রটা ভাষা-আধিপত্যের এক চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে স্বাধীনত্তোর সময় থেকেই। নব্বয়ের সময়েও এই অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় ১৫টি সংবিধান স্বীকৃত তপশিলি ভাষা ছাড়াও ৩৯টি অ-তপশিলি ভাষার অস্তিত্ব ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে এই অঞ্চলে নানা প্রান্তের মানুষ এসেছেন, মহা প্রব্রজনের এই স্রোত এখানের জন বৈচিত্র্য ও ভাষা বৈচিত্র্য তৈরি করেছে। কিন্তু উপযুক্ত যত্নের অভাবে ও বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর আগ্রাসি আচরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীগুলো বিপন্ন হয়নি শুধু, অধিকাংশ লুপ্তির পথে আজ। ১৮৭৬ বা সেই সময় থেকে চা-শিল্পের কারণে এই অঞ্চলে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মানুষেরা শ্রমিক হয়ে আসেন। এদের একটা বড়ো অংশের মাতৃভাষা আজ তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা নয়, লিখবার পড়বার ভাষা নয়। বিরাট একটা জনতা তার মাতৃভাষা থেকে চ্যুত হয়ে গেছেন গত ৫০ বছরে। এই অঞ্চলে 'কুরুখ' ভাষীর সংখ্যা ১৯৮০-তেও ছিল ১৩ শতাংশ, বিগত জনগণনায় তা নেমে এসেছে ২ শতাংশের কাছে। হিন্দি এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা নয়, এমনকী যে ভাষিক গোষ্ঠীর তারা প্রতিনিধি সেটাও হিন্দির থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত হিন্দির প্রসার, রাষ্ট্রের উদ্যোগে, পাশাপাশি এই ভাষাগুলো চর্চা ও ব্যবহার কমে যাওয়া এই ক্ষুদ্র ভাষিক গোষ্ঠীগুলোকে লুপ্ত হওয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষুদ্র ভাষিক গোষ্ঠীর লুপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ সেই ভাষিকগোষ্ঠীর উচ্চ স্তরে থাকা ভাষার প্রতি আকর্ষণ বা ঝোঁক। এই ঝোঁক এবং সরকারের সুনির্দিষ্ট ভাষানীতির অনুপস্থিতি, পাশাপাশি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর আগ্রাসী ভূমিকায় আজ বিপন্ন এই অঞ্চলের মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর বা ভোট-বর্মি/ভোট-চিনীয় ভাষাগোষ্ঠীর মেচ, রাভা, গারো, লেপচা, ডুকপা, টোটো এবং অ-মঙ্গোলীয় বা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠী থেকে আসা সাঁওতালি, কুরুখ, মুন্ডা বা মুন্ডারি, খরিয়া প্রভৃতি ভাষা। নিজের মাতৃভাষায় আজ এদের অধিকাংশ মানুষই কথা বলেন না আর। উদাহরণ তুলে আনলে চমকে যেতে হয়, যা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ আছে, এই পরিসরে তা সম্ভব নয়। তবুও হিমালয় ও সন্নিহিত অঞ্চলের দুটো ভাষা গোষ্ঠীর উদাহরণ নিলে দেখা যাবে ভাষা আগ্রাসনের চেহারাটা কতটা গভীর। লেপচা এই এলাকার প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী, ১৯৭১-এর হিসাবে দেখা যায় যে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ১৫.৩২ শতাংশ লেপচা ভাষা লিখতে পড়তে জানেন। ব্রহ্মপুত্র ও সন্নিহিত পাহাড়ি অঞ্চলের জনজাতি গারো, ডুয়ার্স অঞ্চলেও তাদের আবাস আছে। গারো দের ২৬.৪০ শতাংশ তাঁদের মাতৃভাষা হিসাবে গারো ভাষা উল্লেখ করেছিলেন সেই জনগণনায়। তরাই ডুয়ার্সে চলে আসা সাঁওতালিদের মধ্যে ৪৭.০৬ শতাংশ তাঁদের মাতৃভাষা হিসাবে অন্য ভাষার উল্লেখ করেছিলেন। এই তথ্য নিছক তথ্য নয় একটা সংস্কৃতির মৃত্যুঘণ্টার ধ্বনি।

ছবি : নন্দলাল বসু

আস্তিক-নাস্তিকের মধ্যে বার্তালাপ: একাডেমিক চর্চা

মইদুল ইসলাম

আস্তিক: আপনাকে ঠিক বোঝা যায় না।

নাস্তিক: বুঝবেন কী করে? আমরা দুটি আলাদা ভাষায় কথা বলছি।

আস্তিক: আমরা তো বাংলাভাষায় কথা বলছি। মাতৃভাষায় কথা বলার মধ্যে আনন্দ আছে। তাহলে আপনি বলছেন কেন আমরা দুজনে ভিন্ন ভাষায় কথা বলছি?

নাস্তিক: মাতৃভাষার কথা হচ্ছে না। দার্শনিক ভাষার কথা হচ্ছে। আপনি একটি অন্য দার্শনিক ভাষায় আমার সঙ্গে বার্তালাপ করছেন। এবং আপনাকে যে আমি বোঝাতে অক্ষম হচ্ছি বা আপনি আমাকে বোঝাতে অক্ষম হচ্ছেন তা মোটেই আমাদের মাতৃভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য নয়। আপনার এবং আমার দার্শনিক ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য। রাজনৈতিক তত্ত্বে এর একটা গালভরা নাম আছে— 'এন্টাগোনিসম' যা কিনা 'লিমিট অফ অল অবজেক্টিভিটি'। অর্থাৎ আপনার এবং আমার দার্শনিক ভাষার বৈরিতা এমন যার কোনো বস্তুনিষ্ঠ সমাধান সম্ভব নয়। আর রাজনৈতিক তত্ত্ব থেকে যদি আমরা 'রাজনৈতিক' শব্দটি বাদ দিই তাহলে পড়ে থাকে শুধু 'তত্ত্ব'। দার্শনিক উইটগেনস্টাইনের ভাষায় এন্টাগোনিজম আর ভাষার সীমাবদ্ধতা একটি ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস বা ভাষাগত ক্রীড়া। জীবনে উইটগেনস্টাইন-কে তো নিজের চোখে দেখিনি। তাঁর লেখা পড়েছি, তাঁর উপরে দিকপাল পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছে। গুরু লাকলাউ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল আর তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবার অন্তত এক বছর আগে থেকে তাঁর বইপত্র পড়ছিলাম। বন্ধু একজনকে ফোন নম্বর দেবার পর আর ফোন করে ওঠা হয়নি। কিন্তু লাকলাউ গুরুকে কাছে পাবার আগেই তাঁকে যেহেতু মনে মনে গুরু মেনে নিয়েছিলাম, তাই দূরে, বহুদূরে থেকেও তাকেই গুরু বলে এখনও মানি। লাকলাউ পড়তে গিয়ে উইটগেনস্টাইন পড়তে হয়।

আস্তিক: বৈরিতা বলছেন কেন? দিব্যি তো আমরা ভদ্রলোকের মতো কথা বলছি।

নাস্তিক: ভদ্রলোকেরা বৈরিতা নিরপেক্ষ এটা কে বলল?

আস্তিক: না আমি সেভাবে বলতে চায়নি। বলছিলাম যে আমরা ঠান্ডা মাথায়, নির্বিকার, নির্লিপ্ত হয়ে কথোকপকথন করছি তো, তাই।

নাস্তিক: একই শব্দের অনেকগুলো মানে হয়। সেটা যেমন সাধারণ লেখা-পড়া-বলার ভাষার মধ্যে হয় তেমন দার্শনিক তত্ত্বের ভাষার মধ্যেও হয়। যেমন 'বৈরিতা' শব্দটি রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে সবসময় একটা আগুনখোর বিপ্লব বা উত্তেজনাপূর্ণ বাক-বিতণ্ডার কথা মনে করাবে এমন নয়। আপনি এবং আমি শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মতবিরোধ রেখেও দুটো ভিন্ন সুরে কথা বলছি, দুটো আলাদা দার্শনিক মাপকাঠি নিয়ে বার্তালাপ করছি এবং সেটা করার পরেও আমরা একে অপরকে আমাদের যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ বোঝাতে পারছি না তার মূলে ওই বৈরিতা। বৈরিতা সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৈরিতা ছাড়া সমাজ হয় না। সমাজের ভাঙ্গন হয় না এবং অন্য সমাজের গঠন হয় না।

আস্তিক: আরে আপনি তো খুব সিরিয়াস ভদ্রলোক মশাই। মানে সামান্য কথায় আপনি বেশ গম্ভীর কথা বলতে ওস্তাদ দেখছি।

নাস্তিক: বাঙালিরা ভদ্রলোক নয়। পরশলোক।

আস্তিক: পরলোক? মানে সেটা তো মরার পরে হয়। তাই তো আমি বিশ্বাস করি।

নাস্তিক: পরলোক বলছি না। স্বর্গ-নরক, দোজখ-বেহেস্ত, হেল-হেভেনগুলোয়। মানে সব গুলিয়ে দেয়। ওগুলোয় এমনিতেই বিশ্বাস নেই। পরজন্ম, পুনর্জন্ম এসবে বিশ্বাস নেই। নায়ক সিনেমায় তো উত্তম কুমার বলেছিলেন যে জীবন একটাই— 'একটাই লাইফটাইম, একটাই চান্স'।

আস্তিক: তবে? পরলোক বলতে কি আপনি নিজেকে পর ভাবছেন? মানে আমি নিজ ও আপনি অপর বা পর? সেরকম কিছু ভাবলে আবার ভীষণ মাথা ধরা গম্ভীর ভাবনা হবে।

হালকা মেজাজে কোথায় আপনার সঙ্গে আড্ডা দিতে আসলাম আর আপনি সব পণ্ড করে দিচ্ছেন।

নাস্তিক: আপনি ঠিক করে শুনছেন না।

আস্তিক: তবে কি আপনি নিজেকে বর ভাবছেন? মানে আপনি কি পরবর বললেন? পরের বর! তার মানে আমাদের দেশের বর্তমান যা অবস্থা সেই প্রেক্ষিতে অপর বা পর যথা কোনো মুসলমানের বর। তা সে মুসলিম মহিলাও হতে পারে বা মুসলিম পুরুষও হতে পারে। তাইতো? কারণ নাস্তিকরা তো আবার সমকামী হতে পারে। আপনি কি নটবর? কোলবর? কলবর? কলেবর?

নাস্তিক: আস্তিকরা বুঝি হয় না সমকামী? অবশ্য আপনারা তো ধর্মের দোহাই দিয়ে সমকামীদের একঘরে করে রাখেন।

আস্তিক: আরে হিটলার এবং স্তালিনের মতো নাস্তিক মহাপুরুষরাও তো সমকামীদের দূর ছাই করে তাড়াতো। আপনি তো ওরকম মহাপুরুষ নন।

নাস্তিক: আপনি কিন্তু কথা ঘোরাচ্ছেন। কাপুরুষ নই, মহাপুরুষ তো নইই। কেবল পুরুষ।

আস্তিক: যাক। একটা সদুত্তর পাওয়া গেল। আপনি ভদ্রলোক নন, পর লোক নন, কেবল পুরুষ মানুষ।

নাস্তিক: আপনি কিন্তু এখনও ধরতে পারলেন না। আমি বলেছিলাম বাঙালিরা হল পরশলোক। 'পর' আর 'লোক' এর মধ্যে যে 'শ' আছে তার উচ্চারণ আপনি হয়তো ভাল করে শুনতে পাননি। আমারই ব্যর্থতা।

আস্তিক: পরশলোক? এহেন শব্দ বাপু আমি কোনোদিন শুনিনি? মানে এরকম শব্দ কি বাংলা অভিধানে আছে?

নাস্তিক: নেই।

আস্তিক: ও! তার মানে কী?

নাস্তিক: তার মানে পরশলোক হলেন সেই লোক যাতে তিনি হাত দেন তা সোনা হয়ে যায়। মানে পরশপাথর যেমন যেকোনো ধাতুকে সোনা করে দেয়। পরশলোক হল এমন লোক যেকোনো জিনিসে মনোনিবেশ করলে সাফল্য আসে। বাঙালিদের মধ্যে অনেক পরশলোক আছে। সাফল্য সোনার একটি রূপক বা মেটাফর। ফেলুদা যথার্থ বলেছিলেন সোনার ছেলে কি আর সোনার তৈরি?

আস্তিক: রসিক লোক মশাই আপনি। আপনাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে।

নাস্তিক: সে না হয় পরে করবেন। কিন্তু পরশপাথর আর পরশলোক হওয়া কি এক জিনিস? পরশপাথর যাকে ইংরেজিতে বলে ফিলোসফার'স স্টোন, অর্থাৎ যা হয় না, অকল্পনীয়, অবাস্তব আর পরশলোক যা সাফল্যের এক প্রতিমূর্তি তা কি এক হল? সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' দেখেননি? তুলসী চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয়। তার সঙ্গে ছোটো ছোটো চরিত্রে অসামান্য সব অভিনেতা— কালী বাড়ুজ্যে, জহর রায়, সন্তোষ দত্ত, পাহাড়ী সান্যাল।

আস্তিক: আবার আপনি গম্ভীর এবং গভীর বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বলি আগের জন্মে কি আপনি নকশাল ছিলেন নাকি? বাবার কাছে শুনেছিলাম নকশালরা রসকষহীন হয়ে থাকত ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে আর ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, আমোদ-প্রমোদে তাদের বড্ড অনীহা ছিল আর কথায় কথায় শুধু গুরুগম্ভীর আলোচনা এবং মাঝে মাঝে মানুষ খুন করার (রাজনৈতিক) লাইন আর একটা মুখস্থ করা লাইন 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। আপনি তাদের মানুষ করছেন না এই জন্মে? নাকি পাতাল লোক থেকে উঠে এসে পার্থিব আলোকে তাদের আলোকিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন? কেবল বাজে বক বক করে আমায় জ্বালাতন করে মারছেন।

নাস্তিক: আরে পরলোকে বিশ্বাস করি না তেমন পরজন্মেও বিশ্বাস করি না। তাই আগের জন্মে নকশাল থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে এক প্রাক্তন নকশালের কাছে শুনেছিলাম একটি মজার গল্প। তা হল কলেজ স্ট্রিটে যখন সত্তরের উত্তাল দশকে দেওয়ালে লেখা থাকত 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', কোন এক হরিদাস পাল তার পাশে লিখে দিয়েছিল 'জাপানের রাজা আমাদের রাজা'। আর এই একটি মাত্র জন্মে নকশালদের দেখে ওই পথে যাবার কোনোরকম কামনা-বাসনা কস্মিনকালেও হয়নি।

আস্তিক: কেন? নকশালরা বিশেষ করে মাওবাদীরা এখনও খতমের লাইন মানে বলে?

নাস্তিক: তা একটি কারণ। এখনকার মাওবাদীদের দেখলে বড়ো মায়া হয় যে নেড়া কতবার বেলতলায় যেতে পারে তাই ভেবে!

আস্তিক: মানে? নেড়ার বেলতলা যাবার সঙ্গে মাওবাদীদের কি সম্পর্ক?

নাস্তিক: আরে খতমের লাইন দিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে কিছু হল না। ওই লাইন দিয়ে কি আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল? আর যে চিনের চেয়ারম্যানকে তারা তাদের চেয়ারম্যান বলত এই ভেবে যে তিনি নয়া গণতন্ত্রের দাওয়াই দিয়ে উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে একটি বিকল্প সমাজতান্ত্রিক পথ দেখাতে পারবেন সেই চিন এখন নবউদারবাদী পুঁজিবাদী ও একবিংশ শতাব্দীতে নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে লাইন দশকের পর দশক পুরোদমে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত আর যে দেশকে মডেল করে আমাদের দেশের

কট্টর মাওবাদীরা এখনও গোঁয়ার্তুমি করে যাচ্ছে তাদেরকে নেড়ার বেলতলা যাবার সঙ্গে তুলনা করা ছাড়া আর কী বা বলতে ইচ্ছে করে!

আস্তিক: আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি না হয় নকশাল নন। কিন্তু আপনি যে একটি খেঁকশিয়াল সেটা মানবেন তো?

নাস্তিক: অবশ্যি মানব। কারণ রাজনৈতিক ব্যাকরণে খেঁকশিয়ালপনা ছাড়া জীবনে টিকে থাকা মুশকিল। ফক্স এর সঙ্গে Machiavelian রাজনীতি এবং রিয়ালিস্ট ও প্রাগমাটিস্ট রাজনীতির অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর একটি পুস্তক বিক্রেতা ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতির বিখ্যাত বইগুলোর একটি সিরিজের নাম দিয়েছে Hedgehog and Fox। দ্বিতীয়জন নাকি অনেকগুলো জিনিস জানে কিন্তু প্রথমজন কেবল একটি বড়ো জিনিস জানে।

আস্তিক: আপনি বলছেন ফক্স হল জ্যাক অফ অল ট্রেড বাট মাস্টার অফ নান আর হেজহগ হলেন মাস্টার অফ ওয়ান।

নাস্তিক: বেশ কাছাকাছি বললেন। কিন্তু আমার মুখে এই কথা বসাবেন না, প্লিজ। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের সিরিজের নাম এবং তার উক্তিকে কেবল আপনার সামনে বলেছি। জন্তু-জানোয়ার কি ভাষায় কথা বলে তা বিন্দুমাত্র জানি না।

আস্তিক: আরে এখন জন্তু-জানোয়ার (সরি এনিম্যাল-রা) করে খাচ্ছে। আপনাদের সব একাডেমিক ইতিহাস এবং রাজনৈতিক দর্শনের গবেষণা এখন ওইদিকেই ধাবিত।

নাস্তিক: সব বলা বাড়াবাড়ি হবে। তবে বেশ কিছু গবেষণা হচ্ছে যা মানুষদের ছেড়ে এখন পশুদের ধরেছে।

আস্তিক: ধরেছে মানে? বলুন তাদের নিয়ে অধ্যয়ন করছে। অধ্যাপনা করছে। এই যে মানুষকেন্দ্রিক যত সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা হয়েছে তার থেকে ঢের বেশি পশুদের নিয়ে প্রাণিবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। তাই সমাজবিজ্ঞানকেও তো একটু মানুষ ছেড়ে পশুদের কথা ভাবতে হবে। তা না হলে সমাজবিজ্ঞানীদের মানুষ বলা যাবে কী করে? আজকাল পশুদের নিয়ে গবেষণা না করলে বিধাতা যে প্রাণীজগৎ— আমাদের, মানে মানবজগৎ-এর কল্যাণের জন্য বানিয়েছেন তা টিকবে কী করে? মানুষের অত্যাচারে তো শুধু মানুষ মরছে না। বন-জঙ্গল-প্রকৃতি-পশু-পাখি সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

নাস্তিক: তা আপনি ঠিকই বলেছেন। আজকাল অবশ্য মানুষদের নিয়েই পলিটিক্যালি কারেক্ট কথা বললে চলবে না। পশু-পাখিদের নিয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকতে হবে। মানে বন্দুক ছাড়া উগ্রপন্থীদের থেকে আরো গালাগাল শুনতে হবে। কারণ পলিটিক্যালি কারেক্ট হলেই আজকাল শুনতে হয় নিশ্চই পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের পিছনে কোনো মতলব আছে। অভিসন্ধি ছাড়া মানুষ হতে পারে?

দ্রষ্টব্য: করোনা জমানায় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে মানুষের। মানুষ চিন্তায় আছে, দুঃখ আছে। তাই সবসময় সিরিয়াস আলোচনা না করে পাঠকের মুখে হাসি ফোটাবার উদ্যোগ নিয়ে, সামান্য কৌতুক-রসবোধ নিয়ে এক সাধারণ শিক্ষকের সামান্য Contribution।

ছবি : নন্দলাল বসু

চিঠির বাক্সো

প্রয়াত ড. অশোক মিত্র আমার কাছে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। *আরেক রকম* পত্রিকার স্থাপনাকাল থেকেই আমরা অনেকেই এই পত্রিকাটির সঙ্গে এক বিশেষ অনুভূতি বহন করি। প্রায়শই চেষ্টা করি সংগ্রহ করে পড়তে। ইদানিংকালেও সেই উদ্যোগে ভাটা পড়েনি।

গত সংখ্যার পত্রিকা পাঠ করতে আমি বেশ কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেছি। আমি প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়েই একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বিশ্বাস আপনারা ভুল বুঝবেন না।

আমার মনে হয়েছে যে, পত্রিকায় অনেক মুদ্রণ প্রমাদ পত্রিকার মানের অবনমন ঘটায়। এত ভ্রান্তি-সহ *আরেক রকম* আমার কাছে আদৌ এর ঐতিহ্য এবং সুনামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত আইনবিদ বিকাশ ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধে এতবেশি ভ্রান্তি লক্ষ্য করে বেশ বেদনাহত হয়েছি। অন্য আরো কিছু মুদ্রণ প্রমাদও আমার কাছে পীড়াদায়ক।

আশা করবো, আপনারা আমাকে এ ধরনের পত্রের জন্য মার্জনা করবেন এবং আগামী সংখ্যাগুলির প্রুফ দেখার প্রসঙ্গে বেশি যত্নশীল হবেন। ভালো থাকবেন।

মনোজ ভট্টাচার্য
কলকাতা

[ক্রমাগত ঘটে চলা মুদ্রণ প্রমাদের জন্য মনোজবাবু ও সমস্ত পাঠকের কাছে মার্জনা চাইছি। বর্তমানে এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে *আরেক রকম* ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রুফ দেখার কাজের ক্ষেত্রে লকডাউন জনিত কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আগামী সংখ্যাগুলিতে এই ধরনের ভুল যাতে আর না হয় সেই বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকব। আশা করি মনোজবাবু ও পাঠকেরা আমাদের পাশে থাকবেন। —সম্পাদক]

ছবি : নন্দলাল বসু

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

Issue date 1 August 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 10 Arek Rakam

mio amore™
THE CAKE SHOP

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30